প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৩৬৭

প্রকাশক :—ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রক :—পঞ্চানন চক্রবর্তী
মহামায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩০/৬/১ মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ—রবীন্দ্রনাথ দত্ত

অনিলদা ও রাণীদিকে

এই বইয়ের বেশীর ভাগ লেখা বেরিয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায় 'চাণক্য' ছদ্মনামে 'নগরদর্শনে'; বাকি স্বনামে আনন্দবাজারের রবিবারের পাতায়। লেখাগুলোর পেছনে উৎসাহ ছিল সন্তোষকুমার ঘোষের। তাঁর কাছে এ আমার আর একটা ঋণ।

অ. চৌ.

মার্কিন কনসাল

ঘরে ঢুকতেই সামনে দু-খানা বড় ফটো। পাশাপাশি। মিস্টার ব্যাক্সটার বললেন, "আমার ছেলে আর মেয়ে। মেয়েটি হোস্টেলে থেকে পড়ে, ছেলে মার্কিন নৌবাহিনীতে।"

কলকাতায় মার্কিন কনসাল জেনারেল মিঃ উইলিয়াম ও ব্যাক্সটারের সঙ্গে হ্যারিংটন স্ট্রীট তাঁর আপিস ঘরে বসে সেদিন আলাপ করছিলাম। তাঁকে স্বাগত জানালাম আমাদের এই শহরে। ব্যাক্সটর বললেন "ধন্যবাদ, এসেছি তো এই সেদিনই, ইতিমধ্যেই কিন্তু কলকাতাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

ব্যাক্সটারের কণ্ঠ মৃদু, হাসি স্মিত, চোখে ছাপ বৈদগ্ধ্যের। ধীরে এক একটি কথার পাপড়ি খুলে তিনি যখন কথা বলেন ঠোঁটের কোণে সব সময় লেগে থাকা সেই স্মিত হাসির রেশ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয় এক প্রশান্ত পরিমণ্ডলের মধ্যে বসে আছি।

ব্যাক্সটার হালের রাজনীতিবিদ্, আসলে তাঁর বৃত্তি অধ্যাপনা। ইলিনয়, প্রিন্সটনে ঢাউস ঢাউস ডিগ্রি নিয়ে ফ্রান্সের সোরবোন আর জার্মানীর মিউনিকে পড়েছেন কিছুদিন। তারপর ইস্তানবুলের রবার্ট কলেজে এবং প্রিন্সটনে ইংরেজী ভাষার প্রধান অধ্যাপক পদে বহাল ছিলেন কিছুকাল। ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব লেটার্সে অধ্যাপক ও ডিরেক্টার হিসাবেও কাজ করছেন ১৯৪৪ সাল অবধি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ৫৮ বছরের এই জাত-অধ্যাপকের কূটনীতিবিদ্যায় হাতেখড়ি। মিস্টার ব্যাক্সটার সিগারেটে আয়েসী টান

দিতে দিতে নিজেই বললেন, আংকারা দূতাবাসে ও তেলআভিবে উপদেষ্টা হয়ে কাজ করেছি কিছুদিন। ওয়াশিংটনে গ্রীস, তুরস্ক ও ইরাণ দপ্তরের ডিরেক্টারও ছিলাম এবং মরক্কোর মার্কিন বিমানঘাটি থেকে মার্কিন সেনা সরানোর পর সেখানকার সব ঘাটিকে কীভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে সে সম্পর্কে গত বছর যে মিশন পাঠানো হয়েছিল আমি ছিলাম তার অধিনায়ক।"

"তার মানে ভারতে আপনার আগমন এই প্রথম"—আমি আমি কথার মোড় ঘোরাই।

"তা বলতে পারেন"—ব্যাক্সটার বলেন—করাচি থেকে এক দিনের জন্যে নয়াদিল্লি এসেছিলাম একবার। কিন্তু তাকে কি ভারত দেখা বলে! না, এটাই আমার প্রথম ভারত দর্শন। আর দেখুন ঝটপট বিমানে নেমে হোটেল—কনফারেন্স রুমে মাকু মেরে দেশ দেখা হয় না। তাই এবার কলকাতায় আসার সময় বিমান বাতিল করে জাহাজে এসেছি বম্বে।"

"আর বম্বে থেকে? প্লেনে?—আমার জিজ্ঞাসা।

"না, তাও নয়" আর একটি সিগারেট ধরিয়ে ব্যাক্সটার জবাব দেন,—ট্রেনে। আপনাদের দমদম এয়ারপোর্ট আমার এখনও দেখা হয়নি। বম্বে থেকে দিল্লি। দিল্লি থেকে কলকাতা। দু ধারের বাড়িঘর গাছপালা, ধানের খেত দেখতে দেখতে এসেছি। আমার এবং আমার স্ত্রী দুজনেরই বড় ভাল লেগেছে।'

"আর কলকাতা কেমন লাগছে?"—ফের প্রশ্ন।

"এখনও উত্তর দেবার সময় হয়নি। বাইরে থেকে যেটুকু দেখেছি ভাল লেগেছে। মনে হয়, বেশ লাইভলি সিটি। তবে হ্যাঁ আমার ইচ্ছে, শান্তিনিকেতনে যাই। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছি, শান্তিনিকেতনের কথা সেই কবে থেকে শুনে আসছি, জায়গাটা দেখার সাধ আমার অনেক দিনের।"

ব্যাক্সটার থামতেই আমি বলি—"কলকাতা থেকে খুব কাছে, একশ মাইলের পথ। জায়গাটা আপনার ভাল লাগবে। সব অন্য রকম সেখানে। একবারে ভিন্ন পরিবেশ।"

"আমিও তাই শুনেছি"—ব্যাক্সটার চামড়ামোড়া সোফায় হেলান দিয়ে বলেন।

তারপর একথা সেকথা। কলকাতার সমস্যা, ফরাক্কা বাঁধ, মার্কিন দেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রচার, বিনোবা ভাবে, সি-এম-পি-ও, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় লড়াই, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। এবং অবশেষে বিদায় নেবার পালা। ব্যাক্সটার বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম। আরও খুশী এই কারণে যে আপনি পলিটিক্স আলোচনা করতে আসেন নি।"

"পলিটিক্স আলোচনা করবই বা কেন"—আমি হাসতে হাসতে বলি—"আমি তো শুধু মার্কিন কনসাল জেনারেল সঙ্গে দেখা করতে আসিনি, এসেছি রবীন্দ্র সাহিত্যে অনুরাগী ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত এক নামকরা অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করতে।"

মিস্টার ব্যাক্সটারের ঠোঁটের কোণের সেই স্মিত হাসি গালের দিকে কয়েক কদম এগিয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

কলম সামলান

সাবধান করে দিই আপনার ঐ দামী কলমটা নিয়ে কলকাতার কোন ডাকঘরে, তারঘরে ঢুকবেন না। বরাত ভালো না থাকলে ঐ কলম নিয়ে ফিরে আসা অসম্ভব।

ডাকটিকিট কিনতে যখন লাইন দিয়েছেন, দেখবেন ঐ সময় এক খানা কার্ড বা মণিঅর্ডার ফরম নিয়ে ছোকরা বয়সী লোকটি ব্যস্ততা আর বিনয়ের ভান করে আপনাকে বলবে, "প্লীজ আপনার কলমটা, এই এক মিনিট।" আপনি ভালোমানুষ, দেব কি দেব না' করতে করতে শেষমেষ দিয়েই ফেলবেন। তারপর আটখানা কার্ড, তিনখানা ইনল্যাণ্ড লেটার আর ছ পয়সার, পনেরো পয়সার একগাদা ডাক-টিকিট কিনে আপনি যখন কলম চাইতে গেলেন, আপনার চক্ষু চড়ক গাছ। কাছে বসে যে চিঠি লিখছিল, সে নেই। তাহলে হাওয়া? আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।

তারপর আপনি এদিক ওদিক দৌড়োদৌড়ি করবেন, লোকে ভরা ডাকঘরের প্রত্যেক লোকের দিকে ফিরে ফিরে তাকাবেন, প্রত্যেকের কলমের উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলবেন; কিন্তু কলম আর মিলবে না। দয়া দেখিয়ে আপনি কলমটা দিয়েছিলেন, তাঁর মুখটা পর্যন্ত আপনার মনে নেই, গোঁফ আছে না নেই, রং কালো না ফর্সা সব গুলিয়ে গেছে। অগত্যা বোকা বোকা মুখ করেই বাড়ি ফিরতে হবে।

কলকাতার বড় ডাকঘরগুলো কলম চুরির এক-একটা ঘাটি। বলে কয়ে সরে পড়ার হিড়িক যেমন আছে, তেমনি আছে অজান্তে পকেট থেকে বেমালুম লোপাট করে দেওয়ার। সেদিন এসপ্ল্যানেড ডাকঘরে ভর দুপুর বেলা পরপর চারটে কলম খোয়া গেল। শুধু কি তাই, ট্রামে বাসে, লোকের ভিড়ে শিক্ষানবীশ পকেটমাররা কলম সরিয়ে সরিয়েই হাত পাকায়।

সেদিন নয় নম্বর বাসে, এক মজার ঘটনা। হঠাৎ এক ভদ্রলোক পাদানিতে দাঁড়িয়ে "আমার কলম আমার কলম" বলে চিৎকার শুরু করেছেন এবং তৎক্ষণাৎ পাশের যাত্রীর প্রতি সকলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন, এমন সময় দেখা গেল ভিড়ের ফাঁকফুকুর দিয়ে

কনুই মেরে যে মেয়েটি হেলতে দুলতে এইমাত্র নেমে গেল, তার খোপায় ঝুলছে খোয়া যাওয়া কলমটি। 'রোখকে রোখকে', চিৎকারে বাস থামল। মেয়েটি হতভম্ব।—"কোথায় কলম? কার কলম? ইয়ার্কি পেয়েছেন নাকি, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে জানেন না, পুলিস ডাকব?—" মেয়েটি চোখ পাকিয়ে শাসায়। তখন ভদ্রলোকটি সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "আপনার খোপায় হাত দিয়ে দেখুন দয়া করে।" এবার মেয়েটির লজ্জা পাবার পালা। কলমটি সত্যি সত্যি চুলের ডগায় ঝুলছে।

এই জাতীয় ঘটনা রেল স্টেশনে, বাসে, ট্রামের ভিড়ে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। এলোখোঁপার মালিকের অজান্তেই ঠেলাঠেলিতে অনেক সময় চুলের গোছা বুকপকেটের কলম টেনে নিয়ে যায়। একবার এক ভদ্রমহিলা বাড়ি ফিরে দেখেন তাঁর খোঁপায় নানান জাতের চার-চারটে কলম ঝুলছে। বুঝুন ব্যাপার।

আর এক ধরনের কলম চুরির রেওয়াজ নাকি সম্প্রতি চালু হয়েছে। এক ভদ্রলোক এক চিঠিতে ভদ্রমহিলাবেশী চোরের অভিনব চুরির পন্থা" জানাচ্ছেন। সখের কলমের বিয়োগে তিনি আমাকে অত্যন্ত কাতরভাবে চিঠিখানা দিয়েছেন।

তিনি গিয়াছিলেন গড়িয়াহাটার সিঙ্গি পার্কের এক জলসায়। আধুনিক গানের ডাকসাইটে গাইয়েরা উপস্থিত থাকায় সেদিন স্বাক্ষরশিকারীদের মহোৎসব লেগে যায়। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় ঝিলিকমারা এক অষ্টাদশী তরুণী কাছে এসে কলমটা চাইলেন। বললেন, "অমুকের সইটা নিয়ে একখুনি আসছি, আপনি এখানেই দাঁড়ান।"

চৌধুরী মশাই কলম দান করে দাঁড়ালেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জলসা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও। কিন্তু অপরিচিতা মেয়েটির সাক্ষাৎ আর মিলল না। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও।

এক্ষেত্রে মেয়েটির ভুল হয়েছিল কিনা, বাড়ি ফিরে কলম ফেরৎ না দেবার জন্যে আপশোস করেছিল কিনা জানিনে, কিন্তু এটুকু জানি এইভাবে কলম নিয়ে ফেরৎ না দেওয়ার রীতি অনেক জায়গা-তেই চালু আছে। চুরিতে হাত পাকানোর প্রথম পাঠ কলম। আজকাল তাই কেউ দামী কলম সঙ্গে রাখেন না।

ছ' আনা থেকে ছ টাকার মধ্যে হাজার জাতের কলমে গোটা কলকাতাও তাই ছেয়ে গেছে। এক মার্কিন সাপ্তাহিকে কলকাতা সম্পর্কে যে বোম-ফাটানো রিপোর্ট বেরিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল চৌরঙ্গী পাড়ার প্রতি তিনজনের একজনই নাকি কলম-বিক্রেতা। সন্ধ্যেবেলা চৌরঙ্গী পাড়ায় ঘুরলে মনে হয় রিপোর্টটা বুঝি মিথ্যে নয়। দু'পা যেতে না যেতেই কলম বিক্রেতার ভিড়। ঝকঝকে একরাশ কলম হাতে নিয়ে আপনার কানের কাছে ফিসফিস করে এমন ভাবে কথা বলবে যেন অনেক দামী একটা কলম নেহাৎ আপনাকে খাতির করেই এত সস্তায় দিয়ে দিচ্ছে। ছ আনার কলমে ষাট টাকার ঔজ্জ্বল্য দেখে অনেকে ফাঁদে পা দেন। পরে মাথা চাপড়ান।

সস্তা হোক আর দামী হোক কলম, বই আর দেশলাই এই তিনটি জিনিস কাউকে ধার দিতে নেই। এমন কি কোন বন্ধুকেও না। একবার বেহাত হলেই গেল। আর ফেরৎ আসবে না। বই চুরিটা তো 'সংস্কৃতিমানের' লক্ষণ। ফেরৎ না দেওয়া বই দিয়ে লাইব্রেরি বানিয়ে ফেলার গল্পও আছে। শুনেছি, মার্ক টোয়েনকে নিজ বাড়ীতে মেঝের উপর ইতস্তত ছড়ানো অসংখ্য "বইয়ের মাঝখানে বসে লিখতে দেখে তাঁর কোন এক বন্ধু জিগগেস করেন, এত ভাল ভাল বই গড়াগড়ি যাচ্ছে অথচ কেন তিনি আলমারি বানান না। উত্তরে টোয়েন নাকি জবাব দিয়েছিলেন, বইগুলো যে পন্থায় আমার হাতে এসেছে, সেইভাবে আলমারিগুলো বাড়ি নিয়ে আসা বেশ কঠিন বলেই।"

ন্যাসন-দম্পতি

রেঙ্গুনের প্লেন একটু পরেই ছাড়বে। দমদম এয়াপোর্টের ভি আই-পি রুমে বসে মিসিস ন্যাসন বললেন—"সত্যি চমৎকার দেশ, আপনাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। এমন আতিথেয়তা আর কোথাও পাইনি।"

মিষ্টার ন্যাসনও আমাদের আলোচনায় যোগ দেন। বলেন—'আমাকে যদি জিগগেস করেন, এদেশে এসে আমার সবচেয়ে কী ভাল লেগেছে, আমিও তৎক্ষণাৎ জবাব দেব। হসপিটেলিটি।"

"আর সবচেয়ে খারাপ?" আমার কণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা।

"রেড ট্যাপিজম"—দুজনের জবাব প্রায়ই একই সঙ্গে—"এই কালান্তক লাল ফিতার পাল্লায় পড়ে আমাদেরও কম ভোগান্তি হয় নি।"

ন্যাসন-দম্পতি তিন মাসের ভারত সফর সেরে রেঙ্গুনে চলেছেন, ওঁরা এসেছিলেন এক বিশেষ আমন্ত্রণে, স্বাধীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হ'তে। তাঁদের ভারতদর্শন এই প্রথম। দু জনেই এদেশের জল মাটি হাওয়া আর অতিথিবৎসল মানুষ সম্পর্কে মুগ্ধ!

মিষ্টার জন ন্যাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাম করা শিক্ষাবিদ। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, ওজনে ১৭৫ পাউণ্ড, বয়স সাতান্ন। হার্ভার্ডের এম এ, অক্সফোর্ডে রোডস স্কলার। আগে ছিলেন স্বোর্থমোর কলেজের প্রেসিডেন্ট, এখন কার্লটন কলেজের। তাছাড়া ফরেন

পলিসি এসোসিয়েসনের সভাপতি। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তবু স্বাস্থ্য মজবুত। বলেন—"ক্যান স্টিল বীট মাই সনস্ ইন টেনিস।

নগরদর্শনে আগন্তুক এই মার্কিন দম্পতি বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ, পুণা ঘুরে সফরের শেষ পর্যায়ে এসেছিলেন কলকাতায়। হঠাৎ এক আসরে আলাপ। আলাপ থেকে হৃদ্যতা এবং শেষমেষ সেদিন রেঙ্গুনের প্লেনে তুলে দিয়ে আসি দমদমে।

দুজনেই হাসিখুশি। বিশেষ করে মিসিস হ্যাসন। মুখে হর দম খই ফুটছে।

মিস্টার হ্যাসনকে জিগগেস করেছিলাম, তিনি রিপাব্লিক্যান না ডেমোক্র্যাট।

জবাবে বললেন—আই এম এ রেজিস্টার্ড ডেমোক্র্যাট বাট এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভোটার।'

"এদেশের শিক্ষাপদ্ধতি কেমন লাগল আপনার?"—আবার প্রশ্ন।

"এই মূহূর্তে বলা মুশকিল"—হ্যাসন একটু থেমে বলেন,—"তবে একটা সুলক্ষণ যে এদেশের শিক্ষাবিদরা সমস্যাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। শুধু মনে হয়েছে আপনাদের পরীক্ষাপদ্ধতি পালটানো দরকার। কলকাতায় এসে কয়েকজন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করেছি। লক্ষ্য করলাম তাঁরাও আমার সঙ্গে একমত।

আপনাদের আলোচনা শেষ হতে না হতেই বিমান কোম্পানির এক অফিসার এসে হাজির। প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। মাল পত্র বগলদাবা করে হ্যাসনদম্পতি শুল্ক বিভাগের হেপাজতে যাবার জন্যে তৈরি হন। বিদায় নেবার আগে আমি বলি—"আবার কবে আসছেন আমাদের দেশে!"

"সুযোগ পেলেই"—হাতে ঝাকুনি দিতে দিতে মিস্টার হ্যাসন জবাব দেন এবং সুহাসিনী, সুভাষিণী মিসিসকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যান।

অষ্টগ্রহ সম্মেলন

একদিকে শোনা যাচ্ছে, মেগাটন বোমার তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে কলকাতার আকাশে হানা দিল বলে, অন্য দিকে একের পর এক দুর্ঘটনার দুঃসংবাদ। ঘাটশিলা যেতে না যেতেই টুণ্ডলা। ট্রামে বাসে ঠোকাঠুক, ছাদ থেকে পতন, মূর্ছা এবং মৃত্যু ইত্যাদি তো প্রতিদিন আছেই। সবার মনে এখন তাই আতঙ্ক,—না জানি কখন কী হয়।

আরও শোনা যাচ্ছে বাতাস রেডিও-অ্যাকৃটিভ্ হলে শুধু জীবনান্ত নয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অত্যদ্ভুত বিকৃতি অনিবার্য। ঘুম থেকে উঠে হয়ত দেখবেন, নাকটা হঠাৎ লম্বা হতে হতে হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে, কিংবা দেখা যেতে পারে, ডান পা'টা ফুৎকারে কোথায় উড়েই গেছে। অর্থাৎ রূপকথার সেই রাক্ষসীর মত 'কুলো কানী মূলো দাঁতী' হতে আর বাকি নেই।

ট্রামের ভদ্রলোকটি আসন্ন বিপদের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতে করতে সহযাত্রীকে বললেন—মুশকিল হয়েছে মশাই আমার বিধবা পিসিমাকে নিয়ে। কে একজন বৈজ্ঞানিক জানিয়েছেন, পুঁইশাক খাওয়া এ সময় বিপজ্জনক। লতাপতা, তরিতরকারীতে তো বটেই পুঁইশাকেরই নাকি সবচেয়ে বেশী রেডিও-অ্যাকৃটিভ্ ছাই ধরে রাখার ক্ষমতা। পুঁইশাকই আবার পিসিমার প্রিয়। দেখুন তো কী মুশকিল। আমাদেরও প্রায় এক অবস্থা। ভয়ে ভয়ে বাজার করি, দুর্গানাম স্মরণ করে ভাতের গ্রাস মুখে ফেলি। কে জানে বাবা, কখন কী হয়ে যায়।'

অনেক বাড়ির রান্নাঘরেও এ ধরনের কথাবার্তা চলছে। কেউ

কেউ আবার ভাবছেন, বাজারের জিনিস ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আনলে কেমন হয়। বি. এস সি ক্লাসের ছাত্র 'সায়েন্টিস্ট' ছেলেকে মা কিংবা ঠাকুরমা প্রায়ই জিগগেস করছেন হ্যাঁরে, কুমড়ো' ডগায় তোদের ঐ রেডিও ফেডিও নেই তো?—আছে? তাহলে বাবা ওসব ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই, স্রেফ আলু বেগুন দিয়ে চালাই। বেগুনেও থাকতে পারে? তবে তো গেছি—'

গিয়েছিলাম পাড়ার এক ডাক্তারের কাছে। তিনি বললেন—'না না দুশ্চিন্তা করবেন না। সায়েন্টিস্টরা অনর্থক ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন। রেডিওঅ্যাকটিভ্ ছাই বেশি ঘোরাফেরা করলে বড়জোর ব্লাড-সেলে ক্যানসার থেকে লিউকেমিয়া। তাও রোগী ছ মাস বেঁচে থাকে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিকৃতি ঘটার তেমন কোন আশঙ্কা নেই। ও কিছুই না।'

তা বটে। ভয় পাবার সত্যি সত্যি কিছুই তাহলে নেই। ব্লাড-সেলে ক্যানসার হওয়া!—সে আর এমন কি?

এত সব দুর্ভাবনার মধ্যে আমাদের পরিচিত একজনকে দেখলাম, একেবারে নির্বিকার। কোন একটি বিখ্যাত খবরের কাগজের তিনি একজন প্রবীণ সংবাদিক। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ অফিসে আসে; কিন্তু তাঁর চোখেমুখে কোন উত্তেজনার লক্ষণ দেখা যায় না। সবাই ভাবে ব্যাপারটা কী?

শেষমেষ ঘাটশিলার সেই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সংবাদ এসে পৌঁছল। সহকর্মী একজন তাঁকে গিয়ে বলল—'জানেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে, ট্রেন দুর্ঘটনায় ৩০।৪০ জন মারা গেছে।'

বৈকালিক জলযোগ সেরে তিনি আস্তে আস্তে রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। আবার এক গ্লাস জল খেলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এত জনের মৃত্যুসংবাদেও তাঁর মনে কোন বিকার নেই।

সহকর্মী আবার বললেন—মৃত্যুসংখ্যা আরও বেড়ে যেতে পারে।

এবারে তিনি মুখ খুললেন। নির্লিপ্তকণ্ঠে বললেন—'হবেই, ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই রকমই চলবে।'

'তার মানে ?'

'মানে টানে কিচ্ছু নেই, পিওর স্টারস্ অ্যাণ্ড প্ল্যানেট্‌স্।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ মেগাটন বোমা, এয়ার-ক্র্যাশ, ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, করোনারি থ্রম্বসিস। এ ক'মাস কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। অষ্টগ্রহ সম্মেলন হচ্ছে কিনা।'

সহকর্মীটি কিন্তু আঁৎকে উঠে বললেন—'বাঁচার কোন পথ নেই তাহলে ?'

—'এবারে তিনি সান্ত্বনার সুরে বলেন, ভয় পেলে চলবে কেন ?' আগেই বলেছি সবই স্টারস্ প্ল্যানেটের খেলা। পিওর স্টারস্ অ্যাণ্ড প্ল্যানেট্‌স্।'

তিনি কাজে মন দিলেন।

এত সব দুর্ঘটনা ও মেগাটন বোমার বিস্ফোরণ যে আসন্ন অষ্টগ্রহ সম্মেলনের পূর্বাভাস, একথা আরও অনেক অদৃষ্টবাদীর মুখে শোনা যাচ্ছে। এবং সত্যি মিথ্যে জানিনে এও শুনেছি, কলেজ স্ট্রীট আর সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার পাড়ার ফুটপাত জ্যোতিষীদের পসার ইদানীং বেশ বেড়ে গেছে। আমার এক বন্ধু সেদিন প্লেনে দিল্লি যাবার আগটায় চড়া দামের এক মাদুলি কিনে নিয়ে গিয়েছেন। আর একজন তো বিদেশ যাবার টিকিট ক্যানসেল করার কথা ভাবছেন।

বাঞ্ছিত মুহূর্ত

গত পনের দিন ধরে পাড়া, বে পাড়ার ছেলেদের চাঁদার তাগাদা অনবরত খেয়ে খেয়ে টের পেয়েছি, সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠানেও উৎসাহের প্রাবল্য যথারীতি। এমন কি হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখছি, চাঁদা আদায়-কারীর সংখ্যা এবার যেন কিছুটা বেশি। তবে বালখিল্যদলের প্রত্যেকেই বলছে, "না স্যার, মাইক বাদ দিয়ে দিয়েছি। খরচ ও কমাচ্ছি অনেক। কিছু টাকা প্রতিরক্ষা তহবিলে দেব।"

সত্যিই, মাইকের কলকলনিনাদ এবার কম। অন্যান্য বছর পুজোর আগের রাত থেকেই ওই মাইকযন্ত্রের যন্ত্রণায় পাড়াপড়শীর ঘুম ছোটে।

ছেলেমেয়েদের ব্যস্ততাতে কিন্তু ঘাটতি পড়েনি। ঠাকুর আনতে ছোটা-ছুটি, চালচিত্রের পিছনে আলোর ভোজবাজি দেখাতে সলাপরামর্শ, তিল-হর্তুকী, শাড়ি গামছা ইত্যাদি পুজোর জোগাড় করতে হাঁকাহাঁকি, মণ্ডপের ফিনিশিং টাচ দিতে গিয়ে দুদলে ঝগড়া-ঝাঁটি—সব কিছুই যে কোন পাড়ায় হাজির হলে নজর পড়ে। যে-পাড়ায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি এবং যাদের রেজাল্ট এখনও বেরোয়নি, তাদের মধ্যেই ভক্তিশ্রদ্ধার ঘটা অন্যের চেয়ে এককাঠি বাড়া।

এবং তা' সঙ্গত কারণেই। সরস্বতী যে বিদ্যাদায়িনী দেবী। তাঁকে তুষ্ট না রাখলে সব পরিশ্রমই বরবাদ। অতি-বড় নাস্তিকের মনও

পরীক্ষার বছরে ভালো পুজো দিতে না পারলে মন খুঁতখুঁত করে। মনে পড়ে নিজে যখন ছাত্র ছিলাম এবং অঙ্ক-বৈতরণী পার হবার দুশ্চিন্তায় মাথার সব কটি চুল ছিড়তাম, তখন খাগের কলম আর দুধভরা কালির শিশির সঙ্গে জ্যামিতি, গণিত ও বীজগণিতের খাতা-বই পরম নিষ্ঠায় সরস্বতীর আসনের কাছটিতে রেখে আসতাম।' ঠাকুর প্রণামের সময়ও অঙ্কে তরিয়ে দেবার প্রার্থনা জানাতে ভুলতাম না। অনুমান করতে পারি, সেই ধারা এখনও প্রতি বছর চলে আসছে।

সরস্বতী পুজোর প্রধান আকর্ষণ অবশ্য তার নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলো। ইস্কুলে, পাড়ায় পাড়ায় তাই নিয়ে জোর প্রতিযোগিতা চলে। পথে যেতে যেতে গলির মোড়ে মোড়ে 'শুভ্রাবরণে', 'হংসাসীনার আগমনে', 'বাগদেবীর আরাধনে' ইত্যাদি ঝোলানো বিজ্ঞপ্তি দেখেই যেমন টের পাওয়া যায়, সরস্বতী পুজোর আর দেরি নেই, তেমনি 'ভারতে ভাতু ভারতী' এই মুখবন্ধ নিয়ে গাদা গাদা চিঠি আসছে দেখে ধরে নেওয়া যায়, দু'একদিনের মধ্যেই সাম্বৎসরিক এই যুব-উৎসব শুরু হল বলে।

চিঠির ভাষা উল্লেখ করার মত। সকল রকম কায়দা উজাড় করে না দিলে সব আয়োজনই যেন মাটি। একটির আমন্ত্রণ হচ্ছে এই রকম—

'সুধি, পঞ্চমে সুর তুলেছে কোকিল, আম্রকাননে ফুটেছে সহকার—বনে উপবনে ফুলের বেসাতি। মাঘের ষোড়শ দিবসের শুক্লা-পঞ্চমীর পুণ্যতিথিতে সর্বশুক্লা মা আসছেন ভারতের বিশ্বাসপ্রবণতা আর শান্তিপ্রিয়তার ঐতিহ্য বহন করে। অদূরে শোনা যায়, মায়ের বীণার ঝংকার যা ধ্বংস করে পশুত্বকে—দগ্ধ করে মনের মালিন্য। স্বাগতম জানাই আপনাকে মিলনের মহামন্ত্ররচনা করতে মাতৃমন্দিরে।"

বলা বাহুল্য ভুরকুণ্ড জুনিয়ার হাইস্কুল ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ চিঠির মারফৎ হানাদার চীনের নিষ্ঠুরতা এবং ভারতের শান্তিনীতির কথা জানিয়ে দিতে কসুর করেননি।

বিবেকানন্দ রোডের আদর্শ শিশু ও বালিকা বিদ্যালয়ের আর একটি চিঠির কবিতায়ও চীনা হামলার প্রতিক্রিয়া।

"আজি যে অসুরে নাশে সুরপুরী
তুমি ভদ্রকালী এসো অসি ধরি,
দেখ মা সীমান্ত অতি অশান্ত
এসো সন্তান-বৈরী নাশিনী।"

অনেক চিঠিতে আবার সীমান্ত হামলার নামগন্ধ নেই। যেমন—

"পলাশ কিংশুকের কোরকে আলোর রেখা ফুটিয়ে চূত মঞ্জুরীর সুবাস বাতাস ছুটিয়ে রাতুল চরণের আঘাতে অজ্ঞান তমসার আবরণ ঘুচিয়ে দেবী বীণাপাণির শুভ আবির্ভাব প্রত্যাসন্ন শুক্লা পঞ্চমীর পুণ্যক্ষণে। ঐ বাঞ্ছিত মুহূর্তে ভক্তিকুসুমে দেবীর পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানকল্পে হিলি রমানাথ উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে আমাদের পূত প্রযত্ন সফল হয়ে উঠুক আপনার সবান্ধব সাহচর্যে।"

শহরের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সেই "বাঞ্ছিত মুহূর্ত" আসে প্রতি বছর। পুজোর প্রাক্কালে কল্পনায় দেখতে পাই, শীতের রোদ্দুরে চুল এলিয়ে সদ্যোস্নাতা তরুণীর দল থালি হাতে চলেছে অঞ্জলি দিতে। ছোট ছেলেরা শার্ট-প্যাণ্টের খোলস ছেড়ে অনভ্যস্ত ধুতির কোঁচা সামলাতে সামলাতে ছুটছে দিদিদের পেছনে। যে-ছেলে বাড়িতে কোনদিনও খড়কুটো সরায় না, সেও কোন্ মন্ত্রবলে হঠাৎ কাজের লোক হয়ে গেছে, মণ্ডপে 'এটা আনতে, ওটা রাখতে' তার জুড়ি নেই।

এবং মণ্ডপ জুড়েই উৎসবের সুর। ধূপের ধোঁয়া, শাঁখের আওয়াজ আমের মুকুলের গন্ধ আর অঞ্জলিমন্ত্রের উচ্চারণে জমজমাট। তারই

মাঝখানে আলো ঝলমল দেবী বীণাপাণির মুখে হাসি। সেই হাসি ছড়িয়ে গেল সবখানে—কলকাতায়, সারা বাংলাদেশে।



দিস ইজ ক্রিকেট

হ্যালো, ৪৬,……, কে ঘণ্টে নাকি?

তোর ছোড়দি কোথায়? খেলা দেখতে গেছে? কী খেলা? সুজাতা, মানে তোর ছোড়দি তাহলে জন্মদিনটা মাঠেই পালন করবে? তা—বেশ বেশ…কী বললি, পিকনিক? খেলা দেখতে দেখতে বন্ধুদের একসঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে,…তা বেশ বেশ,—

রিসিভার রেখে আবার টেলিফোন করলাম, এণ্টালিপাড়ার এক মাসিমাকে। রবিবারের সকাল। টেস্ট খেলার টিকিট পাইনি। বাড়িতেই একা-একা বসে আছি।

—হ্যালো, ৪৪….হ্যালো, হ্যালো, কে? মাসিমা বাড়িতে নেই? কোথায়, কালীঘাটে? —এঁ্যা। ক্রিকেট খেলা দেখতে —ও তাই বল্। টালিগঞ্জ থেকে মাসিমার এক ননদও আসবেন

মাঠে? কী বললি? বিয়ের সম্বন্ধ?—বুঝেছি, বুঝেছি আর বলতে হবে না—'

হনুমানদাসজীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক চায়ের আসরে। টেলিফোন করতে বলেছিলেন। এতদিন পর আজ সময় পেলাম।

—'হ্যালো, ৫৫······হনুমানদাসজী হ্যায়? নেই? কোথায় গেছেন? কাঁহা গ্যয়া? ক্রিকেট খেলা দেখতে?—ব্যস ব্যস—'

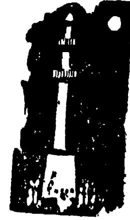
রিসিভার নামিয়ে রেখে ভাবি, কী ব্যাপার? গোটা কলকাতা ক্রিকেট খেলা দেখতে গেল নাকি? তবে যে শুনেছিলাম. সীজন্ টিকিট পাওয়াই যায় না! পাড়ার ক্রিকেট-পাগল ছেলেগুলো তবে একখানাও টিকিট পেল না!

শীতের দাপট কমতে না কমতেই শহরে এখন আলোচ্য বিষয় ক্রিকেট। একদল আছেন ইডেন উদ্যানে, অন্যরা দলে দলে রেডিওর সামনে। রোজকার খেলা শেষ হতেই পাড়ায় পাড়ায় এবং ট্রামে বাসে পোস্টমোর্টেম আলোচনা।

চতুর্থ টেস্ট শুরু হবার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা গিয়েছিলাম মাঠের উত্তরদিকে চার টাকার লাইনে। সেখানে তখনই প্রায় কুম্ভমেলার ভিড়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে থেকে লাইন পড়েছে।

সেই ভিড়ের মাঝখানে আলাপ হল অনিল কাঞ্জিলালের সঙ্গে। খেলার মাঠে যাঁদের যাতায়াত আছে, তাঁদের অনেকেই চেনেন এই কাঞ্জিলালকে। বনগাঁ বাড়ি। কুচকুচে কালো চেহারা। বয়স উত্তর-তিরিশ। চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচ হলে যেমন লাইনে প্রথম কি দ্বিতীয়, ক্রিকেট টেস্ট হলেও চার টাকার লাইনের প্রথম তিন-চার-জনের মধ্যে। গত ক' বছর এই চলছে।

দেখলাম খবরের কাগজের ফটোগ্রাফার রিপোর্টার সবাই এই কাঞ্জিলালের নাম জানেন। সেদিন একজন ক্যামেরাম্যান আসতেই কাঞ্জিলাল একগাল হেসে বলেন,—'এই যে দাদা, আমি এখানে!'



যেন যীশু

ফর্সা রঙ, টিকোলো নাক, আর টানাটানা চোখ। পিঠের উপর এলিয়ে পড়েছে ঘন কালো চুল আর দু গাল বেয়ে বুকের কাছে নেমে এসেছে লম্বা কালো দাড়ি। দেখে মনে হয়, যেন যীশু খৃস্ট নেমে এসেছেন হঠাৎ।

গায়ের রঙীন জামা আর পিঠের চুল পেছন-থেকে দেখে প্রথমে কিন্তু ভেবেছিলাম কোন বিদেশিনী বুঝি বসে আছেন! মুখ ফেরাতেই ভুল ভাঙলো। এবং আলাপের সুরুতেই বৃটিশ পর্যটক উইলিয়ম জর্জ ওয়েভার একগাল হেসে বললেন—'আমার চেহারা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছেন তো! আর বলবেন না মশাই, এই চুল দাড়ির জন্যে আমার কম ভোগান্তি হয়নি।'

"কী রকম?"

"আর কী রকম! ভারতে এসেছি লাফা-যাত্রী হয়ে। পা দিতে না দিতেই নিত্যি নতুন ফ্যাসাদ। আমার চেহারা দেখে হিন্দুরা ভাবে হিমালয়ের সাধু, শিখরা ভাবে তাদের গুরুভাই আর মুসলমানদের ধারণা, আমি নির্ঘাৎ আউলিয়া ফকির। রাজস্থান বেড়াতে এসে মহাবিপদেই পড়েছিলাম। এক গ্রামের ভেতর দিয়ে হাঁটছি। হঠাৎ ছুটে এল একদল লোক। চুল দাড়ি আর ফর্সা রঙ দেখে ওরা ভেবে বসল হিমালয়ের কোন সাধু। ব্যস, আর যায়

কোথায়, একের পর এক লুটিয়ে পড়তে লাগল আমার পায়ে। আমি পালাবার পথ পাই না। শেষমেষ যখন ফাঁক বুঝে দৌড়োলাম, জনতাও আমার পিছু নিল। প্রাণের দায়ে ঢুকে পড়লাম এক ইস্কুল মাস্টারের বাড়িতে। মাস্টার ভদ্রলোকের মাকে আকারে ইঙ্গিতে সব কথা খুলে বলতে, তিনিও বলেন—'না বাবা, মিছে কথা বলছ, তুমি বিদেশী নও, নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ।' আমি ভাবি, সর্বনাশ, একেবারে তপ্ত কড়াই থেকে গনগনে আগুনে। যেই না দেখলাম ভদ্রমহিলা অন্য ঘরে গিয়েছেন, পেছনের পাঁচিল টপকে দে দৌড়।"

ওয়েভার একটু দম নিয়ে আবার বলেন—"অমৃতসরেও তাই হয়েছিল। শিখেরা আমায় স্বর্ণ মন্দিরে ধরে বেঁধে নিয়ে গেল। গুরুভাই বলে গ্রহণ করে তারা লোহার বালা, পাগড়ি, চিরুনি সব আমাকে দিয়েছে। আমার চেহারাটা শিখের মতন কিনা।"

ওয়েভারের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। লাফা-যাত্রী হয়ে ভারতে এসেছেন। বাড়ি ওয়েলশে। বুকে একটি ড্রাগনের প্রতীক আঁটা। ওটা নাকি ওয়েলশের জাতীয়তাবাদীদের চিহ্ন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম ভ্রমণের নেশা তিনি কোত্থেকে পেয়েছেন। বললেন—"ও আমার রক্তের মধ্যে থেকে গেছে। আমার ঠাকুর্দা আমেরিকা পালিয়েছিলেন। বাবাও তাই। সারা জীবন এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইউরোপ ভ্রমণ সাঙ্গ করে আমিও বেরিয়ে পড়লাম এশিয়ার পথে। অন্য লোকে যা খুশী বলুন, লাফা-যাত্রীদের পক্ষে আদর্শ জায়গা এই ভারতবর্ষ। পথের লরিওয়ালারাও বরাবর খাতির করেছে আমাকে। তাছাড়া যেখানেই গিয়েছি খাতির পেয়েছি ঘরে ঘরে। আমার এই চুল দাড়িওলা চেহারার ফলাফল ভাল মন্দ দুই-ই হয়েছে।

ওয়েভার ১৯৬০ সনের জুলাই মাসে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন মাত্র চারশ টাকা সম্বল করে। একুশটি দেশ ঘুরে ভারত। ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ,—পূর্ব এশিয়ায়।



গোয়া দখলের পর

কানু ছাড়া যেমন গীত ছিল না, বছর কয় আগে শহরে গোয়া ছাড়া তেমনি কথা নেই। ক্রিকেট টেস্টের সীজন টিকিট না পাওয়ার দুঃখ, বড়দিনের আনন্দ—সব চাপা পড়ে গেছে। শহরে সবারই মুখে এক কথা—গোয়া, গোয়া, গোয়া।

ভোরের কাগজ নিয়ে তো কাড়াকাড়ি। সোমবার বিকেলে আনন্দবাজারের টেলিগ্রাম যখন বেরোল হৈ হৈ ব্যাপার। হাজার হাজার কপি ফুৎকারে হাওয়া। একটি চায়ের দোকানে টানাটানিতে কাগজ তিন টুকরো।

তাছাড়া হঠাৎ পথের মোড়ে দেখি চমৎকার একখানা পোস্টারে লেখা একটি ছড়া এবং সেটি আবার পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী সালাজারের উদ্দেশ্যে লেখা। মনে হল, পাড়ার কোন উঠতি কবি এই 'দুষ্কর্মটি' করে রেখেছেন। ছড়াটি এইরূপ ;—

সালাজারকে—

গোয়া দমন দিউ
চিল্লাতা তুম কিঁউ।

দিউ গোয়া দমন
এল তোমার শমন।
দমন দিউ গোয়া,
চোখে দেখছ ধোঁয়া।

পর্তুগীজ ভাষা জানা থাকলে অনুবাদ করে লিসবন পাঠিয়ে দিতাম। সালাজার সাহেব পড়ে নিশ্চয় তারিফ করতেন।

গোয়া দখলের সংবাদ এই শহরের গোয়ানিজ মহলে বেশ উৎসাহের সঞ্চার করেছে। সংখ্যায় ওরা প্রায় আড়াই হাজার। তাঁদের বেশির ভাগই দুতিন পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা। কিছু সম্প্রতি মারাগাঁও, পঞ্জিম থেকে এসেছেন।

আমার চেনা একজন গোয়ানিজ আছেন। তিনি তালতলায় থাকেন। আসলে পঞ্জিমের লোক। তাঁর কাছে সেদিন গোয়া আর তার রাজধানী পঞ্জিমের কথা শুনছিলাম।

তিনি বলছিলেন, "চোখের সামনে ভাসছে পঞ্জিম। আমাদের ভাষায় পন্‌জী"। ওপাশে আরব সাগর, এপাশে মাণ্ডবি নদী। শহরে ঢোকার মুখে ঐতো 'হোটেল মাণ্ডবির ছয়তলা বাড়ি, গোয়ার একমাত্র স্কাই স্কেপার। আশে পাশে অসংখ্য একতলা দোতলার সারি। ছোট শহর, ছিমছাম চেহারা আর গানের গুনগুন, গিটারের টুংটাং।'

ভদ্রলোকটি খানিক তন্ময় হয়ে আবার স্মৃতিমন্থন শুরু করেন। —শহরের লোকসংখ্যা আর কত—হাজার পঁচিশ। কিন্তু পিচের রাস্তা, বিজলি বাতি, কলের জলে আধুনিক সব বন্দোবস্ত। ফেরি লঞ্চে খেয়াঘাট পার হওয়ার পর রাস্তায় গাউন পরা লিপষ্টিক মাখা গোয়ানিজ তরুণী যেমন দেখতে পাবেন, তেমনি পাবেন মালকোচা দেওয়া শাড়িপরা মহিলার দল। হাওয়াই শার্ট কোটপ্যাণ্ট আর ধুতি পাগড়িতেও মাখামাখি। আর একটু এগোলেই দেখতে পাবেন

বাংলো প্যাটার্নের ছোট ছোট একতলা বাড়ি। বেশিরভাগ টালির। হোটেল মাণ্ডবি ছাড়িয়ে নদীর ধারের রাস্তার কিছুদূর গেলেই সরকারী দপ্তর। দেখবেন সেখানে মোটা মোটা হরফে লেখা—"Portugal esta aqui",—অর্থাৎ Portugal is here, পর্তুগাল এইখানে।

কিন্তু আজ সে তো অতীতের কথা। গোয়ার বুক থেকে পর্তুগালের নাম এখন ধুয়ে মুছে গেছে। এখন সেখানে লেখা হয়েছে —ভারত এইখানে, গোয়া ভারতের। বিমাতার অনাদর থেকে মুক্তি পেয়ে আমার পঞ্জিম, আমার গোয়া আবার মায়ের কোলে ফিরে এসেছে।"

ভদ্রলোক আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন। বললেন,—"ভাবছি এখন একবার দেশে যাব, নতুন চেহারা দেখে আসব। তবে হ্যাঁ, পঞ্জিমের মতই মনে পড়েছে গোয়া মুক্তি-আন্দোলনে নিহত অসংখ্য শহীদের কথা. ডক্টর গাইতোণ্ডের কথা। গাইতোণ্ডের নাম শুনেছেন কি? আমাদের পূজ্য নেতা, নামকরা সার্জন। ১৯৫৪ সনে লিসবন যখন গোয়াকে ঘোষণা করল Provincia Ultramar অর্থাৎ 'সমুদ্রপারের প্রদেশ', পঞ্জিমে সেদিন সরকারী ভোজনসভার আয়োজন হয়েছিল। ডাঃ গাইতোণ্ডে ছিলেন আমন্ত্রিতের একজন। ভোজসভার প্রধান বক্তা সালাজারের নামে 'টোস্ট প্রোপোজ' করে ধন্যবাদ দিতে দাঁড়াতেই গাইতোণ্ডে চেঁচিয়ে উঠলেন 'Protesto'—আমি প্রতিবাদ করি। ব্যস্ হয়ে গেল। গ্রেপ্তার করে তৎক্ষণাৎ তাঁকে নির্বাসন দেওয়া হল লিসবনে। অকথ্য অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ছাড়া পেয়েছেন অনেক পরে।

"আর একজনের কথাও মনে পড়ছে" বলে ভদ্রলোক বলে চলেছেন—"তাঁর নাম ফাবিয়ান ড্য কস্তা, মারগাঁওয়ের কাছে সেরাউলি গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত ক্রিশ্চিয়ান বংশের ছেলে। অমন জাতীয়তা-

বাদ আর কারও ভেতর দেখিনি। গ্রামের পাদ্রি আর আর্কবিশপের সঙ্গে লড়াই করে তিনি নিজের তিন ছেলের কী নাম রেখেছেন, জানেন?—জওহরলাল, জয়প্রকাশ আর রবীন্দ্রনাথ। এই দ্য কস্তারেরও ষোল বছরের জেল হয়েছিল।”

ভদ্রলোক থামলেন। মনে হল, আমি এখন আর কলকাতায় নেই। গোয়ায়। পঞ্জিমে। হোটেল মাণ্ডবিতে। দ্য কস্তার বাড়িতে।



আসামের খবর

না, আজও এল না।

ভদ্রমহিলার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তাঁর পাঁচ ছেলে পাণ্ডুতে। রেলে চাকরি করে দু'জন, তিনজন গেছে বেড়াতে। ভায়ের কাছে। হঠাৎ আসামে আগুন! একহপ্তা ধরে তাদের কোন খবর নেই। তার করেছিলেন, প্লেনে কলকাতায় চলে আসতে। তার পেল কিনা কে জানে। চিঠিও নেই।

রোজ তিনি যান দমদম। চার চারটে প্লেন আসে গৌহাটি থেকে। আর আসে স্পেশাল। সব কটিতে আতঙ্কবিহ্বল বাঙালী বোঝাই। ঘটিবাটি কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সবাই পাড়ি দিচ্ছে। বাঙালীদের এখন পর্যন্ত শেষ নিরাপদ আশ্রয় এই কলকাতায়। ১৯৬০ সাল।

ইস্পাতের ডানা ঝটপটিয়ে এক একটা প্লেন থামে আর ভদ্রমহিলা ছুটে যান উৎসুক চোখ নিয়ে। হ্যাঙ্গারটা লাগলো। কোলে বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে এক দঙ্গল লোকের পেছনে পেছনে আসছেন মাঝবয়সী ভদ্রলোক, ঐতো নামলেন পেট মোটা মাড়োয়ারী, হ্যাট পরা সাহেব, তার সামনেই আর একদল নিগৃহীত ছিন্নমূল বাঙালী। ঝাপসা চোখ দুটো শাড়ির অাঁচলে মুছে ভদ্রমহিলা ভাল করে তাকান। এক একজন করে যাচ্ছে। যেন 'আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড'। না, কোন চেনামুখ নেই। তাঁর ছেলেরা কেউ আসেনি। একজনও না। চোখ আরও ঝাপসা।

ছুটে আসেন এনকোয়ারিতে। টেলিফোন কানে বসে থাকা "নীলবসনা সুন্দরীকে" জিজ্ঞেস করেন—আবার কখন গৌহাটির প্লেন?—আরও দুটি আছে! স্পেশালও বাকী। আবার ক্ষীণ আশা, আবার প্রতীক্ষা।

ভদ্রমহিলা ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরে বেড়ান প্যাসেঞ্জার হলের এ মাথা ও মাথা। কখনও বসেন গদিমোড়া সোফায়, কখনও তাকান রাণওয়ে-র দিকে। গৌহাটি তেজপুর ডিব্রুগড় থেকে আসা যাত্রীদের জিগগেস করেন, আসামের খবর? পাণ্ডুতে কিছু হয়নি তো? সেখানে আগুন লেগেছিল, তার থেকে রেল কলোনী কতদূর? কেউ উত্তর দেন, কেউ দেন না।

দমদম বিমানঘাটির প্যাসেঞ্জার-হলেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার দেখা। লোকে গিজগিজ করছে। যেন হাওড়া শিয়ালদা। অধিকাংশই আসাম-ফেরৎ বাঙালী আর আসামের সংবাদ-প্রত্যাশী লোক। ঐ ভদ্রমহিলার মত আরও অনেকেই আশঙ্কাকুল অস্থির পদচারণায় দমদম বিমানঘাঁটি মুখর করে তুলেছেন।

প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক প্যাসেঞ্জার হলে এসে ঢুকলেন। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছেন। একদল লোক তাঁকে

ঘিরে ধরল। "—গৌহাটি থেকে তো? খুব মেরেছে বুঝি?" আহা রে। "গৌহাটি নয়, তাহলে ডিব্রুগড়" "পরিবারের আর কেউ বাঁচেনি? সব মারা গেছে?" "উলটো মারতে পারলেন না খুনে বেটাদের?" "পালিয়ে এলেন কী করে? ঈস্,—হায়রে কাছে যদি পেতাম ও তরফের কাউকে।"—

একজন বললে—"জবাব দিচ্ছেন না কেন মশাই।" দেখলাম লোকটার চোখে প্রতিহিংসার আগুন।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ভদ্রলোক হাজার রকম প্রশ্নের ঠ্যালায় বোকা বনে গেছেন, কথা বলার ফাঁকই পাচ্ছেন না। একজন ছোকরা সহানুভূতির সুরে বললে—"আহারে, মারের চোটে একেবারে বোবা হয়ে গেছেন।"

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ পর কথা বলার ফুরসৎ পেলেন। বললেন, "মাপ করবেন, আমি বোম্বে থেকে আসছি, পুণার কাছে এক মোটর অ্যাকসিডেণ্টে পড়েই আমার চোট লেগেছে। আচ্ছা, নমস্কার।"

নিতান্ত নিরাশ হয়েই ভিড় ভদ্রলোককে ছেড়ে দিল। আবার এগিয়ে গেল অন্য একদল যাত্রীর দিকে। আসামের খবর জানতে।



পাষাণ কান্না

লোকটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল ফুটপাতে। সুখলাল কারনানি হাসপাতালের সামনে লোয়ার সারকুলার রোডে। মাঝবয়সী

চেহারা। পরনে নোংরা শার্ট, প্যান্ট। হাতে বাজারের থলি। খুব সম্ভব কোনো বড়লোকের বাড়ীর গৃহভৃত্য।

লোকটা মারা গেছে। দু'পা, দুহাত ছড়ানো। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে কষ। ডান কানের পাশ দিয়ে তখনও গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। নিশ্চয় আকস্মিক পতনের চিহ্ন। এবং সম্ভবত এই একটু আগেই থ্রম্বোসিস বা অ্যাপোপ্লেক্সিতে আক্রান্ত হয়ে সে হঠাৎ বিদায় নিয়েছে।

তখন সকাল। সাড়ে নটা। অফিসের সময়। মৃতের পাশ দিয়ে হন হন চলে যাচ্ছে শত শত পথচারী। চলে যাচ্ছে বাস, ট্যাক্সি, গাড়ি। কারও থামবার ফুরসৎ নেই। অনেকেরই সময় নেই তাকাবার। যাঁরা অতি মূল্যবান সময় নষ্ট করে লোকটার দিকে তাকিয়েছেন, 'আহা রে, বেঘোরে প্রাণটা দিল' ছাড়া আর কিছু বলবার ফুরসৎ পাননি। দু'একজন শুধু কাতর চ্চুক চ্চুক ধ্বনি ছাড়া অন্য বাক্য বাজে খরচ করতে পারেন নি। কী করেই বা পারবেন, অফিসের সময় হয়ে গেছে যে!

এই হল আমাদের কলকাতা। নিষ্ঠুর, নির্দয়, নির্মম। অতিকায় এক হাসপাতালের দোরগোড়ায় দিনের বেলা একটি প্রাণ বিদায় নিল, অথচ গোটা শহর নির্বিকার! একবার খোঁজ নেবারও প্রয়োজন কেউ মনে করল না। লোকটি কে, কীভাবে মারা গেল? নাকি এখনও জীবনের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায় নি, আশা আছে?

অন্যের কথা বাদ দিই; আমি নিজেও তো সেই পথ দিয়ে তখন যাচ্ছিলাম, কিন্তু থামিনি। ট্যাক্সি ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেছে। কেননা, কাজ আছে, জরুরী কাজ।

হায়রে, রাজধানী, পাষাণ কায়া।



নিমন্ত্রণ

বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল একডালিয়া রোডের এক বাড়িতে। চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের এলাহি ব্যবস্থা। একটুর জন্যে দ্বিতীয় কিস্তি মিস্ করেছি। তৃতীয়ের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তা থেকেই শোনা যাচ্ছে হাঁকডাক।—"ওরে, বাঁড়ুজ্জে মশাইকে আরও দুখানা লুচি দে—মাংস, আর একটু মাংস নিন, প্লীজ,—না না, রুই মাছের কালিয়া আর এক প্লেট আপনাকে নিতেই হবে"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম কিস্তির খাবারের ভগ্নাবশেষ কে যেন ঝুড়ি বোঝাই করে আমার কাছেই এক ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে দৌড়োলো। ফেলতে না ফেলতেই ডাস্টবিনে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনটে নেড়ি কুকুর আর দশ বারো বছরের দুটি বাচ্চা ছেলে। কুকুরের মুখ থেকে কেড়েকুড়ে খানকতক ছেঁড়া লুচি, কিছু মাংসের হাড়, কিছু মাছের কাঁটা সরিয়ে নিয়ে ছেলে দুটি বেরিয়ে এল। কাঁধের গামছা ফুটপাতে ছড়িয়ে তাতে ঢালল বহু কষ্টার্জিত এই খাদ্যসম্পদ।

ওদের মুখে তৃপ্তির হাসি। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। লুচির গায়ে লাগা নোংরা আবর্জনা ঝাড়তে ঝাড়তে মুখোমুখি বসল দুজনে। কথায় বার্তায় মনে হল দু'ভাই। গায়ে নোংরা গেঞ্জি, ছেঁড়া প্যাণ্ট।

হঠাৎ মাংসের হাড়ের স্তূপ থেকে উদ্ধার করল একখানা আস্ত অমৃতি। চীৎকার দিয়ে উঠল আনন্দে। অমৃতিটা ভাগ করে নিয়ে একজন আর একজনকে বলছে—"বল তো, এটার দাম কত ?

"কত আর হবে, এক আনা !"

"দূর বোকা, যা না দোকানে, দেখবি, চার আনার কম নয়।"

"খেতে ভারী মিষ্টি রে !"

"হবে না, খাঁটি মাল যে।"

পরম তৃপ্তিতে অমৃতিটা চুষে চুষে খেয়ে এবারে মাংসের হাড় আর মাছের কাঁটার সৎকারে মন দিল। খেতে খেতে একজন বলছে —"শালার বাবুরা সব হাড়কিপটে। চুষে চুষে সব খেয়েছে, হাড়ের গায়ে একরত্তি মাংস রাখে নি।"

"মিহিদানাও বোধ হয় খাইয়েছে রে, এই গ্যাখ হাড়টার গায়ে কয়েকটা দানা লেগে রয়েছে। চুষতে গিয়ে কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি লাগল, হাত দিয়ে দেখি মিহিদানার গুঁড়ো"—অন্যজন আপন মনে বকেই চলেছে।

উচ্ছিষ্টের সদ্ব্যবহার করে কিছু লুচি গামছায় বেঁধে নিয়ে ওরা গলা জড়াজড়ি করে খানিক বাদেই চলে গেল। এদিকে চোঁয়া ঢেকুর তুলে, পান চিবোতে চিবোতে একদল খাইয়ে বেরিয়ে এলেন। তৃতীয় কিস্তির আশায় আমিও বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

সেদিন আমার পেটভরে খাওয়া হয় নি।



নারীর জীবিকা

একদিন ঝি না এলেই মাথায় বজ্রাঘাত। ভোরবেলা এঁটো বাসনের পাহাড় দেখে গিন্নীর মেজাজ তিরিক্ষি, কর্তার সকালবেলার চা'ও বরবাদ। বাকী দিনটাই বিশৃঙ্খলার মধ্যে কাটল ঝি নামধারী সামান্য এক রমণীর অনুপস্থিতে।

কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারে ঝিয়ের আসন পাকা। নূতন পাড়ায় বাড়ী বদল করে প্রতিবেশীর কাছে প্রথমেই খোঁজ নিতে হয় —"ঝি কোথায় পাওয়া যাবে?" ঠাকুর-চাকরে সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন। কিন্তু ঝি? গৃহস্থালীতে প্রায় অনিবার্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগ কলকাতার মেয়েদের জীবিকার্জনের এক সমীক্ষা করছেন। তাতে দেখা গেছে জীবিকাধারী মেয়েদের শতকরা ৩৫ ভাগই ঝি বা রাঁধুনী। ঝির সংখ্যাই বেশী। এই সংখ্যা নাকি দিন দিন বাড়ছে।

ঐ সমীক্ষায় অনেক নূতন নূতন তথ্য পাওয়া গেছে। তার দু' একটি আপনাদের কাছে উপহার দিই।

কলকাতার মেয়েদের জীবিকার্জনের ব্যাপারে ঝিয়ের পরেই আসে ভূস্বামিনীর দল। জীবিকাধারী মেয়েদের শতকরা ১৫'৫৫ ভাগের জমিজমা ও বাড়ীভাড়ার আয় নিয়েই চলে। স্ত্রীর নামে সম্পত্তি 'বেনামী' করার রেওয়াজ ইদানীং বাড়ছে বলেই নাকি নারী জীবিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন ভূস্বামিনীর দল।

সমীক্ষার মতে মোটামুটি পঁয়ত্রিশটি শ্রেণীতে জীবিকাধারী মেয়েদের ফেলা যায়। তার মধ্যে পতিতা-বৃত্তিতে আছেন শতকরা ১০ জন। বাকীদের মধ্যে শিক্ষক শতকরা ৮ ভাগ, খুচরা দোকানের মালিক ৩·৫ ভাগ, নার্স ও ধাত্রী ৩·৩ ভাগ, ঝাড়ুদার, মেথর ৩ ভাগ, কেরানী ২·২ ভাগ, ধোপানী ২·২ ভাগ, দর্জি ২ ভাগ, টেলিফোন অপারেটর ১·৭ ভাগ, টাইপিস্ট-স্টেনোগ্রাফার ১·৬ ভাগ, সেল্‌স উয়োম্যান ১·৬ ভাগ, হকার ১·৬ ভাগ, কুমোর ১·৪ ভাগ। তাছাড়া গয়লানীর কাজে, কারকাখানার কাজেও রোজগার করছেন বহু মেয়ে।

সমীক্ষার পরিসংখ্যাণে আরও দেখা গেছে, কলকাতার রোজগেরে মেয়েদের শতকরা ১·৪ ভাগ নাচগান আর ছবি একে জীবিকার্জন করছেন। সর্বশেষের তথ্যটিই নূতন। এবং আশাপ্রদ।



গলিতে বিস্ময়

বৃদ্ধ ওস্তাগর লেনে এক বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। কানাগলির এক খুপরিঘরে চোখ পড়তেই দেখি চমৎকার শিল্পকাজের নানা নমুনায় সারা ঘর আলো হয়ে আছে। সবই পাকা হাতের কাঠের কাজ। বিরাট বিরাট মূর্তি, গাছ, লতাপাতা, নকশা। অখ্যাত গলির গহ্বরে কে এই প্রতিভাবান শিল্পী ?

কৌতূহল মেটাতে গিয়ে আর এক দফা বিস্ময়। খোঁজ নিতেই

জানা গেল ঘরের এক কোণে অশীতিপর যে বৃদ্ধা জবুথবু বসে আছেন, শিল্পী তিনিই। বৃদ্ধা সরলা দাসী আলাপী। দু' মিনিটেই আলাপ জমে উঠল। অখ্যাত প্রতিভা হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দে আমিও অন্য কাজ ভুলে গেলাম।

সরলা দাসীর বয়স এখন আটাত্তর। তিনি বালবিধবা। জন্মসূত্রে সূত্রধর পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন সহজাত শিল্প প্রতিভা। আগে ছিলেন ঢাকায়। দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তু সেজে ঠাঁই নিয়েছেন বই-বাঁধাই দলের পাড়া বৃদ্ধ ওস্তাগর লেনের এই বাড়ীতে।

ছবি-আঁকা, কাঠে নকশাকাটা, কারও কাছ থেকে তিনি শেখেননি। ছোটবেলা থেকেই তাঁর হাতে কেমন করে যেন এসে গেছে। নেশাখোরের মত দিনরাত ছবি এঁকেছেন, কাঠে নকশা তুলেছেন। এক গাল হেসে বৃদ্ধা বলেন—"এখন হাত চলে না বাবা, কাজ না করে স্বস্তি পাই না।"

ঘরের ভেতর যে দু'একটি নমুনা দেখলাম, তাতেই আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুরুচি সম্পন্ন কারুকলা। একেবারে জাত শিল্পীর কাজ। আলাপে জানতে পারলাম ঢাকায় হোমরা-চোমরা অনেকের বাড়ীতেই তাঁর হাতের কাজের নমুনা ছিল। শুধু কি তাই, দেশপূজ্য যে সকল নেতা ঢাকা সফরে গিয়েছেন, তাঁরা প্রায় সবাই সরলা দাসীর হাতের কাজের একটা না একটা নমুনা নিয়ে এসেছেন। ওয়ার্ধা আশ্রমে পঞ্চাশের মন্বন্তরের একটি অতিকায় কাঠের কাজ আছে। মহাত্মা গান্ধী নিয়ে যান।

দার্জিলিঙে এখানকার রাজভবনের 'বলরুমের' দোড়গোড়ায় যে দুটো কাঠের হাতি শোভা পাচ্ছে, সে দুটোই সরলা দাসীর তৈরী। ১৯২০ সালে বাঙলা দেশের লাট লর্ড কারমাইকেল ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে অনুরোধ করেন, দুটো কাঠের হাতি তৈরী করিয়ে

দিতে। নবাব বাহাদুর সরলা দাসীকে দিয়ে করান। দেখলাম, চুনবালি ওঠা দেওয়ালের গায়ে লর্ড কারমাইকেলের একখানা প্রশংসাপত্র এখনও ঝুলে আছে। এই ধরনের অযাচিত সম্মান এসেছে কখনও কখনও, তাছাড়া তাঁর গত ষাট সত্তর বছরের শিল্পী জীবন রয়ে গেছে আড়ালে, অজ্ঞাতে।



ভ্রান্তি বিলাস

সেদিন প্রেস ক্লাবের তাঁবুতে শিল্পী সতীশ গুজরাল সস্ত্রাক এসেছিলেন। কিছুদিন আগে আর্টিস্ট্রি হাউসে তার এক চিত্র-প্রদর্শনী হয়ে গেল। সতীশ গুজরাল বধির। ঐ একই প্রতি-বন্ধকতায় তাঁর জিবে এসেছে জড়তা। কথা বুঝতে কষ্ট হয়। সেদিনকার ঘরোয়া বৈঠকে তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্যে গুজরাল শিল্পচর্চা সম্পর্কে নানা কথা বললেন। গুজরালের শিল্প-কাজে যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি তাঁর চিন্তাধারায়ও মৌলিকত্বের অভাব নেই।

গুজরাল বহুদিন মেক্সিকোতে ছিলেন। সেখানকার পয়লা নম্বরী শিল্পী সিকিরস তাঁর গুরু। সিকিরস বছর কয়েক আগে পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর আমন্ত্রণে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর কলকাতা আগমন নিয়ে এক মজার কাহিনী আছে।

সিকিরস সস্ত্রীক দমদমে নামবেন। প্রধানমন্ত্রী কন্যা ইন্দিরাকে পাঠালেন মান্য অতিথিকে স্বাগত জানাতে। পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের পক্ষ থেকেও গেলেন হোমরা-চোমরা অনেকে। মুশকিল বাঁধলো গোড়াতেই। কেউই সিকিরসকে চেনেন না। ইন্দিরা গান্ধীও না। এদিকে প্লেন আসার সময় হয়ে এল। কী করা যায়?

ইন্দিরা গান্ধীর অনুরোধে বিমানঘাটির কনট্রোল রুম থেকে ঐ প্লেনেরই পাইলটের কাছে জানতে চাওয়া হল, সিকিরস নামে কেউ প্লেনে আছেন কিনা। পাইলট জানালেন—'উঁহু, ঐ নামের কেউ নেই।'

শুনে ইন্দিরা গান্ধী তো 'রেগে আগুন তেলে বেগুন।' বলে কি পাইলট, নিশ্চয়ই আছেন, আবার খোঁজ করুন।

দৌড়লেন পুলিশ অফিসার। কনট্রোল রুম থেকে আবার বেতারবার্তা। পুলিস অফিসারটি পাইলটকে বললেন—'দেখুন সিকিরস প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর অতিথি। অভ্যর্থনা জানতে দমদমে অনেকে এসেছেন। কিন্তু কেউই তাঁকে চেনেন না। চেনার সুবিধের জন্যে দমদমে প্লেন থামতেই তাঁকে প্রথম নামাবার ব্যবস্থা করুন, আর আপনি হাত নেড়ে ইশারা করবেন।' পাইলট বললেন—'অল রাইট।'

গাঁক গাঁক করতে করতে বিমান দমদম বিমানঘাটিতে থামল। মালা হাতে ইন্দিরা গান্ধী প্রস্তুত হলেন।

দরজা খুলতেই বেরিয়ে এলেন কোট-টাই পরা এক ভদ্রলোক। সস্ত্রীক। পাইলট পেছন থেকে হাত নাড়লেন। পুলিস অফিসার ইন্দিরা গান্ধীকে বললেন—'এই হলেন সিকিরস, আর তাঁর স্ত্রী। ইন্দিরা মালা হাতে এগিয়ে গেলেন। গলায় মালা ঝুলিয়ে দিতেই স্মিতহাস্যে ভদ্রলোক বললেন—'হাউ ডু ইউ ডু।' অভিবাদন বিনিময় যথারীতি হয়ে গেল। সবাই মোটরগাড়ীর দিকে এগোলেন।

এমন সময় দেখা যায়, প্লেন থেকে নেমে আর একজন ভদ্রলোক কাকে যেন, কী যেন খুঁজছেন। কিন্তু কেউই তাঁর দিকে নজর দিচ্ছে না। পুলিস অফিসারটির সন্দেহ হল। তিনি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'আপনি কি কাউকে খুঁজছেন ?"

ভদ্রলোক বললেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি হচ্ছি মিস্টার সিকিরস, প্রধানমন্ত্রী—

ভদ্রলোকের বাক্য সমাপ্তির আগেই পুলিস অফিসারের চোখ কপালে গিয়ে ঠেকেছে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। জানালেন কেলেঙ্কারীর কথা। ইন্দিরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসেন। আবার ছোটাছুটি, হৈ চৈ। সঙ্গের ভদ্রলোকের গলার মালার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে ইন্দিরা ছুটলেন আসল সিকিরসের কাছে।

পুলিস অফিসার গেলেন নকল সিকিরসের কাছে। পুলিসী পিস্তল-চোখ পাকিয়ে বললেন—এই রসিকতা করার মানে কী ? কেন আপনি, নিজেকে সিকিরস বলে পরিচয় দিলেন ?

ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন—'কই আমি তো নিজেকে সিকিরস বলে পরিচয় দিই নি ?

"প্লেন থেকে নামতেই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম"—পুলিস অফিসারের জেরা।

ভদ্রলোক এক গাল হেসে বলেন—'আপনি কী বলেছেন, না বুঝেই আমি তখন ঘাড় নেড়ে দিয়েছি। প্লেন থেকে নেমে কানে কিছুই শুনছিলাম না।'

"তাহলে আপনি কে ?"

"আমি হচ্ছি তাইল্যাণ্ডের যুবরাজ, আর এই আমার স্ত্রী"।



বিদায় শীত

এবারের মত শীত বিদায় নিয়েছে। অফিসে, বাড়িতে আবার পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ড্রাইং ক্লিনিংয়ে জমা হচ্ছে গরম কাপড়—কোট, প্যাণ্ট, শাল। আইসক্রীম শরবতের ব্যবসাদার সুখের দিন গুণছে। মাঠে ময়দানে শিমূল পলাশের হাসিও ফুটি-ফুটি।

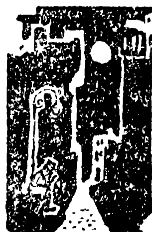
শীত যে বিদায় নিয়েছে তার প্রমাণ আর এক দফা পেলাম এসপ্ল্যানেড ট্রাম গুমটির পাশে কানসাফ-করেনেওয়ালাদের সংখ্যা কমতে দেখে। শীত পড়তেই দেখা গিয়েছিল, ঐখানে পুরু পিচবোর্ডের আসন বিছিয়ে ৩০।৪০ জন কানসাফওয়ালা দিব্যি আসর জমিয়েছে। পরণে শার্ট আর লুঙ্গী, নয় তো পা-জামা। প্রায় সবাই মুসলমান, কানে তুলো, হোমিওপ্যাথির বাক্সের মত ছোট খাট বাক্সে নানা রকম নরুন, চিমটে আর রঙীন তেলের শিশি। শীতের মিঠে রোদে পিঠ দিয়ে খদ্দেররা বসে গেছেন পিচবোর্ডের আসনে। আর এরা পরম যত্নে সরু চিমটে, সুগন্ধি তেল আর নরম তুলোর কারসাজিতে কানের গহ্বর থেকে টেনে নিয়ে আসছে আবর্জনার স্তূপ। দক্ষিণা দু'আনা, 'ইস্পিশাল' চার আনা।'

ওদেরই একজনের নাম শামসুল। শামসুলের বাড়ী মুর্শিদাবাদ। কিন্তু কথাবার্তা বলে বাংলা-হিন্দীতে। বল্লে—বাবু দিনে দু'

রুপায়া, তিন রুপায়া হইয়ে যায়। শীতের মরসুম। শীত গেলতো কাম্‌ভি খতম।

কাজ অবশ্যি একেবারেই চলে যায় না। এরা তখন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। কিছু খদ্দের জোটে, কিন্তু শীতের মত নয়। শুনেছি গোটা ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ লোক এই ব্যবসা দিয়েই পরিবার চালায়। কলকাতাতেই আছে তিন চার শ।

খদ্দেরদের মধ্যে অধিকাংশই অবাঙ্গালী, বিশেষ করে বিহার আর উত্তর প্রদেশের লোক। গত কয়েকদিন থেকে দেখছি ট্রাম-গুমটিতে ওদের পিচবোর্ডের আসন একটি একটি করে কমছে। এখন ঠেকেছে সাতটা কি আটটায়। শীত পুরোপুরি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এসপ্ল্যানেড ট্রামগুমটি থেকে ঐ পরিচিত দৃশ্যও এবারের মত মুছে যাচ্ছে। শীতের মত শহরের সব কিছুরই এখন পালাই পালাই ভাব। কিন্তু কেন রে এত যাবার ত্বরা কেন?



সেনেট ভবন

আসুন এ সপ্তাহে একটু বিলাপ করি। বহু স্মৃতিবিজড়িত বহু মনীষির পদধূলিপূত সেনেটভবনের জন্যে। দেশলাইবাক্স মডেলের এযুগীয় অসংখ্য বাড়ীর মাঝখানে খিলানে-স্তম্ভে স্তম্ভিত করা ঐ অতিকায় বাড়িটি পথের ধূলোয় গুড়িয়ে পড়েছে। তার জায়গায় নতুন বাড়ি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ঘটনার সাক্ষী সাতাশী বছরের বৃদ্ধ এই সেনেট ভবন। তার প্রতিটি ইটের পাঁজরে অনেক কাহিনী গাঁথা। ১৯৩৩ সালে এই বাড়িরই সুবৃহৎ হলে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল কমলা-স্মৃতি বক্তৃতামালায়। সুগম্ভীর নাদে উচ্চারিত হয়েছিল 'মানবধর্ম' সম্পর্কে বিশ্বকবির বাণী। এই বাড়িতেই 'বাঙ্গলার বাঘ' আশুতোষ বৃটিশ শাসকের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদ জানিয়ে হুঙ্কার দিয়েছিলেন। বলে-ছিলেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয় দাস তৈয়ারীর কারখানা হবে না।" এই বাড়িতেই প্রাচ্যের গৌরব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রীর সম্মান নিতে এসেছেন ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড, পঞ্চম জর্জ; রেভাঃ কে এম ব্যানার্জি, ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার, স্যর তারকনাথ পালিত, জর্মন সাম্রাজ্যের রাজা ও যুবরাজ, অধ্যাপক হারমান ওল্ডেনবার্গ, অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, ডক্টর ভাণ্ডারকর, স্যর গুরুদাস, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর সি ভি, রমন, অধ্যাপক এ আর ফরসীথ। মাত্র কিছুদিন আগে এই বাড়িতে সর্বশেষ ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে গেলেন দিনেমার বিজ্ঞানী অধ্যাপক নীল্স বোর।

এই বাড়িতেই কমলা-স্মৃতি বক্তৃতামালা দিয়েছেন অ্যানি বেশান্ত সরোজিনী নাইডু, স্যার শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, উ নু, মাদাম কুরী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি ওয়ারেনের পায়ের ধূলোও পড়েছে এই বাড়িতে।

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিজ্ঞানই শুধু নয়, বহু রাজনৈতিক ঘটনার, বহু স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতিও সেনেট ভবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। এই সেনেট হলে শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন। উৎসবের সভাপতি বাঙ্গালার গবর্ণর সার জন এণ্ডারসন। শান্ত সুগম্ভীর উৎসবমঞ্চে হঠাৎ

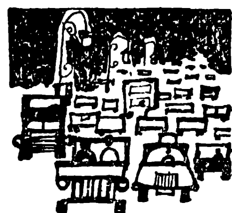
বিস্ফোরণ। সদ্য-স্নাতক শ্রীমতী বীণা দাসের হাত থেকে বেরিয়ে এল রিভলবারের তাজা কার্তুজ। বিপ্লবী মেয়েটির লক্ষ্য স্যার জন এণ্ডারসন।

১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় যখন শুরু হল, তখন তার নিজস্ব কোন বাড়ি ছিল না। ১৮৭২ সালে ৪,৩৪,৬৯৭, টাকা ব্যয়ে তৈরি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাড়ি, এই সেনেট ভবন। ১৮৭৩ সালের ১২ মার্চ ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন তৎকালীন উপাচার্য শ্রী ই, সি, বেইলি এবং বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড নর্থব্রুক।

এই বাড়িতেই হত বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন, সেনেটের সভা, সিণ্ডিকেটের সভা। উপাচার্যও এই বাড়িতে বসতেন। দ্বারভাঙ্গাভবন উঠতেই উপাচার্য চলে গেলেন নতুন বাড়ীতে। ১৯৩৪ সালের পর থেকে সেনেটের সভাও ঐ বাড়ীতে চলে গেল। শুধু পরীক্ষা আর দু'একটি সভাসমিতির জন্যে পড়ে রইল ঐ অতিকায় সেনেট ভবনের সুবৃহৎ হল।

সারা বছর বিরাট হলঘর খাঁ খাঁ করতে থাকে। চামচিকে আর পায়রার দল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। দুপাশে গড়াগড়ি দেয় আশুতোষ মিউজিয়মের নানা মূর্তি। ভেতরে অনিমেষ চেয়ে থাকে মনীষীদের অতিকায় অতিকায় তৈলচিত্র।

চামচিকে পায়রারও দিন শেষ। নতুন বাড়ী উঠেছে। উঠেছে নতুন সেনেট ভবন, শতবার্ষিকী ভবন, হালফ্যাসানের দশতলা, ছয়তলা। সেই বাড়ীতে চামচিকে পায়রার স্থান নেই। তাদের উদ্বাস্তু সেজে সন্ধান করতে হবে অন্য কোন জবরদখল কলোনীর।



ঠাকুরবাড়ি

সাত পুরুষ যেখানে মানুষ, সেখানকার মাটি নাকি সোনার বাড়া। আর যেখানে একের পর এক নয় পুরুষের বাস, যেখানে দীর্ঘ ১৮০ বৎসরের গৌরবময় ইতিহাস, সেখানকার মাটি ?—নিশ্চয়ই সে প্রাণের বাড়া।

কিন্তু তবু প্রাণাধিকের মায়া ছাড়তে হয়, তবু চলে যেতে হয় ; যেমন ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুরানো আবাস ছেড়ে চলে যেতে হ'ল সেখানে বসবাসকারী শেষ 'ঠাকুর'কে।

নতুন ঠিকানায় তাঁর এই বাড়ি বদল, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই দিনটিতেই লক্ষ্মী আর সরস্বতীর, প্রতিভা আর ঐশ্বর্যের যুগলমিলনে দীপ্ত এক নবমাঙ্ক নাটকের সমাপ্তি ঘটল।

সে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা। সেই বছরেরই জুন মাসে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারের বাসের সূত্রপাত। তার আগে আদত বাড়ি পাথুরেঘাটায়। নীলমণি কনিষ্ঠ-ভ্রাতা দর্পনারায়ণের কাছ থেকে নগদ এক লক্ষ টাকা নিয়ে পাথুরেঘাটার পৈতৃক-আবাস ছেড়ে চলে এলেন জোড়াসাঁকোর পল্লীতে, জোড়াবাগানের বৈষ্ণবচরণ শেঠের কাছ থেকে পাওয়া এক বিঘা

জমিতে। সেখানে মাথা তুলে দাঁড়াল তিন-চার মহলার এই বিরাট বাড়ি।

নীলমণির নাতি দ্বারকানাথ—'প্রিন্স টারাগোনা।' ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধি তখন তুঙ্গে। দ্বারকানাথের জীবন অত্যাশ্চর্য এক রূপকথা। তারপর পটপরিবর্তন। দ্বারকানাথের ছেলে দেবেন্দ্রনাথ। পরিচয়ে মহর্ষি, কিন্তু আসলে রাজর্ষি। অর্থ আর পরমার্থের সমন্বয়ে তাঁর জীবন স্মরণ করিয়ে দেয় রামায়ণযুগের রাজা জনককে।

দেবেন্দ্রনাথের পুত্রকন্যারা সব কীর্তিমান। এখানেই জন্ম দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী এবং শেষোক্ত হলেও অন্যূন রবীন্দ্রনাথের। এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িই এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্ম, মৃত্যু আর বহু সৃষ্টির ভূমি। এবং এই বাড়িতেই জন্ম নিয়েছেন দেবেন্দ্র-সহোদর গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এবং দিনেন্দ্রনাথ, সরলা দেবী, বলেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিখ্যাত বঙ্গসন্তান।

ঠাকুরবাড়ি তখন বঙ্গদেশের মুকুটমণি, সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান। সাহিত্য-সৃষ্টি, সংগীতচর্চা, অভিনয়কলা, স্বদেশসেবা, সমাজ-সংস্কার, ব্যবসা-বাণিজ্য—সব বিষয়ে এই বাড়ির লোকেরা পুরোভাগে। বারান্দায় দেবেন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক সাধনায় ধ্যানমগ্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ দক্ষিণের বারান্দায় 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখে চলেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোয় নতুন গৎ তুলছেন। ওদিকে মহড়া চলছে নতুন নাটকের। বাইরের মহলে হেমেন্দ্রনাথ কুস্তির প্যাঁচ কষছেন পালোয়ানের সঙ্গে। গিরীন্দ্রনাথ ফুলের বাগান নিয়ে ব্যস্ত। সত্যেন্দ্রনাথ ঘরের বৌকে নিয়ে পার্টি থেকে এইমাত্র ফিরেছেন সদর দেউড়িতে। চাকরবাকরের ঠেলাঠেলি, দাসী-ফিরিওয়ালার আনাগোনা, আলোর রোশনাই, গানের সুর, কবিতার কলি, টাকার ঝনঝন—সব মিলে

গোটা ঠাকুরবাড়ি তখন অকল্পনীয় এক বিস্ময়ের জগৎ।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছে এই বাড়িতেই। তিনি যখন জন্ম নিয়েছেন, তখন "বাড়ি-ভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই ; নানা মহলের চাকর-দাসীর নানাদিকে হৈ হৈ ডাক। সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী ধামা-কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরি-তরকারী, দুখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে, বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনী নতুন ফ্যাসান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে, মাইনে-করা যে দিনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে হাপর ফোঁস ফোঁস করে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আসছে খাজাঞ্চিখানায়, কানে পালকের কলমগোঁজা কৈলাস মুখুজ্জের কাছে পাওনার দাবি জানাতে, উঠোনে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরী। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে। চটাপট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশবার ঘন ঘন। ভিখিরির দল বসে আছে বরাদ্দ ভিক্ষার আশা করে।"

দিন যায়, বছর যায়, একে একে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি খালি হয়। প্রথমে নতুন আবাসে গেলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এবং শান্তি-নিকেতনে নতুন ঠিকানা হল রবীন্দ্রনাথের। একের পর এক ঘর খালি হয়, ঠাকুর-পরিবার ছড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথও ছিলেন ওই বাড়িতে এই সেদিনও। তাঁর মৃত্যুর পর সেই ধারার আর চিহ্ন নেই। ঠিক তেমনই নেই, দিনেন্দ্রনাথের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের, আরও অনেকের।

অবশেষে একদিন ঠাকুরবাড়ির পাঁচ নম্বর নিবাস ছেড়ে চলে গেলেন অবনীন্দ্রনাথ। বাড়ি গেল মারোয়াড়ীর দখলে। স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের চেষ্টায় গঠিত রবীন্দ্র-স্মৃতি তহবিলের অর্থে সেই

বাড়ি আবার কিনে প্রতিষ্ঠা হল রবীন্দ্রভারতীর। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিনে নিলেন সমস্ত বাড়ি, দায়িত্ব নিলেন একে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার, সেখানে প্রতিষ্ঠা হল নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের।

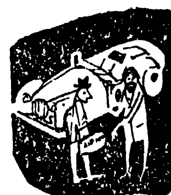
সব যেতে যেতে ওই বাড়িতে টিঁকে রয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের দুটি ধারা। বছর কয় আগে তারই একটি চলে যায়। শেষ চাওয়া চেয়ে চলে গেলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, সুধীন্দ্রনাথের পুত্র সৌম্যেন্দ্রনাথ।

সর্বশেষ বাকি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের আর এক পৌত্র অজীন্দ্রনাথ। সম্প্রতি তিনি শান্তিনিকেতন প্রবাসী। গত রবিবার যে-'ঠাকুর' পুত্র অচিন্দ্রনাথকে কোলে নিয়ে শেষবারের মত জোড়াসাঁকো ছেড়ে চলে গেলেন অভীন্দ্রনাথ—অজীন্দ্রনাথের পুত্র মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রপৌত্র। নীলমণি থেকে অচিন্দ্রনাথ—নয় পুরুষ।

সাবেকী আমলের আসবাব, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, আর বহু স্মৃতি-চিহ্ন ট্রাকের পিঠে সওয়ার হয়ে ওই ঐতিহাসিক দিনে পেরিয়ে যায় দ্বারকানাথের গলি, চিৎপুর, মেছোবাজার, চৌরঙ্গী। অবশিষ্ট মালপত্রের তদারকীর জন্যে আর মাত্র কয়েকটি দিনের জন্যে সেখানে থেকে গেছেন একজন—অভীন্দ্রনাথের মা দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতবৌ, রবীন্দ্রনাথের "মহিষী" শ্রীযুক্তা অমিতা দেবী।

তিনি চলে যাবেন, শুধু থাকবে প্রতিটি ইঁটের পাঁজরে গাঁথা অঢেল ভালবাসা, অফুরান গান, অসংখ্য স্মৃতি আর উনবিংশ ও বিংশ—এই দুটি শতাব্দীকে জোড়া লাগানো একটি সাঁকোর অবশেষ।

এবং জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এখন শুধু নামে থাকবে, সেখানে আর 'ঠাকুর' থাকবে না।



মেকসিকান-দম্পতি

প্রথমেই দমে গেলাম এয়ারলাইন্সের লজ্ঝড় বাসে চড়ে। এবং মেক্সিকান-দম্পতীটি তৎক্ষণাৎ আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন।

ওঁদের সঙ্গে আলাপ বারাণসীতে। জাতে টুরিস্ট। বোম্বাই দিল্লি আগ্রা বারাণসী সেরে শেষ কিস্তি কলকাতায়। মহিলাটি সুন্দরী। চোখে, চুলে, রঙে, গড়নে ভূমধ্যসাগরীয় মাদকতা। সুতরাং উপযাচক হয়ে আলাপ করতে আমি বেশী সময় নষ্ট করলাম না।

আলাপ জমল ওঁরা কলকাতা বেড়াতে যাচ্ছেন শুনে, এবং ওঁদের চারচোখ বিস্ফারিত করার জন্যে যতখানি দরকার, তার চেয়ে খানিক বেশী মশলা দিয়ে "ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী", "সৌন্দর্যের শিরোমণি" কলিকাতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরলাম। বললাম, "বোম্বাই, দিল্লি কলকাতার কাছে কিছুনা।" স্বামী-স্ত্রী দুজনেই মুগ্ধ। বললেন—"হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি "ক্যালকাতা ইজ এ গ্রেৎ সিটি, বিউতিফুল সিটি।"

অতঃপর আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা। দমদমে রাত দশটায় নামলাম একই প্লেনে এবং কলকাতার দোষগুণের সমস্ত দায়িত্ব তৎক্ষণে আমার ঘাড়ে।

কিন্তু প্রমাদ গুণলাম এয়ারলাইন্সের হাড় জিরজিরে জরদ্গব-মার্কা বাসের ঝাঁকুনি খেয়ে। এমনই তার চলন, তিনচাকা এগিয়ে

দু'চাকা পিছায় এবং রাস্তার খানাখন্দের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে সব যাত্রীর শরীর ওলটপালট করায়।

আমি গুম মেরে রইলাম। মেক্সিকান-দম্পতীও শরীরের সঙ্গে সীটের যোগাযোগ কোনক্রমে বাঁচিয়ে জানালার দিকে তাকালেন। দেখে আমার অবস্থা আরও কাহিল। কী চেহারা দু'পাশের! আলোর ঝলমলানি আদৌ নেই, টিমটিম করে জ্বলছে দু'চারটা বাতি, খোলা নর্দমা উদ্‌গার করছে দুর্গন্ধ, ঘুঁটে আর পোস্টারে ভাঙা ভাঙা বাড়িঘর বিচিত্রপোচাকী, গরুর গাড়ি পাশ কাটাতে চাইছে খড় বোঝাই লরীকে, খোলার ঘরের সামনে ধুনী জ্বালিয়ে বিড়ি ফুঁকছে দেহাতীরা, যেদিকে চোখ যায় কোথাও কোন ছিরি-ছাঁদ নেই।

আমাদের কারও মুখে কথা নেই। 'বিউতিফুল সিটির' 'বিউতি' দেখে বুঝিবা একেবারে তন্ময়। মনে মনে ভাবলাম, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে পৌছলে নিশ্চয় বিদেশী ট্যুরিস্ট খানিক স্বস্তি পাবে। আমিও পাব। স্তব্ধতা ভেঙে আমতা আমতা করে বললাম —"এটা হল গিয়ে, যাকে বলে, বুঝলেন কিনা আউটস্কার্টস, এই মানে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া আর কি। আর একটু এগোলেই শহর মানে ইণ্ডিয়ার সবচেয়ে বড় 'সিটি' মানে রিফিউজি প্রবলেম, মানে ওভার পপুলেশন, মানে বুঝলেন কিনা -"

মিস্টার মেক্সিকো আমার দেঁতো হাসিতে তেমন সাড়া দিলেন না এবং মিসিজ মেক্সিকো কটমট করে আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ বুঁজলেন।

এল পাঁচ মাথার মোড়। উঁহু আমারই যেন কেমন মনে হচ্ছে। চোখে কেন লাগছে নাকো নেশা? আলো মিটমিটে, বাড়িঘর নোংরা নোংরা, গাড়িঘোড়াও দু'চারটে। কয়েকদিন ধরে ঘুরে এসেছি দিল্লি আর উত্তর প্রদেশের কয়েকটি শহর। তাদের পাশে আমাদের কলকাতার যে একেবারে দীনহীন চেহারা। যেমন দিল্লি,

তেমন বোম্বাই—একেবারে ঝকঝকে। এই টুরিস্ট দম্পতী ভারতের ওই দুই জায়গা দেখা সেরে অনেক আশা নিয়ে এসেছেন কলকাতা। কিন্তু ওঁরা দূরে থাক, আমার নিজেরই সব অন্য রকম মনে হচ্ছে। দমদম বিমানঘাটি থেকে কলকাতা শহরের রাস্তা তো কদর্যতায় অতুলনীয়, খোদ শহর এলাকাও যেন বার্ধক্যে, জরায় জবুথবু। অন্য শহর দিন দিন নতুন হচ্ছে, আলোয় হাসিতে ঝলমল হচ্ছে, আর আমাদের কলকাতা, আমাদের গর্বের কলকাতা? অনাদরে অবহেলায় দিনদিন হতশ্রী।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সঙ্গী বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার অবস্থা পর্যন্ত আমার যেন নেই।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, কখন যেন পৌঁছে গেছি এয়ার লাইন্সের সিটি অফিসে। মেক্সিকান-দম্পতীদের কিছু না বলে চোরের মত পালিয়ে চলে এলাম। রাত তখন এগারটা।



লেলিনের দেশ থেকে

ফেলিক্স উর্লভ্ অবাক হয়ে চোস্ত বাংলায় জিগগেস্ করলেন' "আপনি মস্কো গিয়েছিলেন নাকি?

"না যাইনি, যাওয়ার সুযোগ হয়নি"—জবাব দিলুম।

"তাহলে রুশ ভাষা শিখলেন কোত্থেকে?"—উর্লভের ফের প্রশ্ন।

"আপনি বাংলা শিখলেন কোত্থেকে?"—আমার পাল্টা প্রশ্ন।

"মস্কোতে।"

"আপনি বাংলা শিখেছেন মস্কোয়, আর আমি রুশী শিখেছি কলকাতায়।"

উর্লভ্ আমার জবাব শুনে হাসলেন। রুশীতে তর্জমা করে দিলেন অন্য দুই রুশীকে। ওঁরা হাসলেন তর্জমার হাসি।

এই রকম হাসি ঘনঘনই হচ্ছিল। এবং হাসিতে, চায়ে, খোশ-গল্পে সেদিন আমাদের রুশ-ভারতী আড্ডা জমজমাট হয়ে উঠেছিল। দলে ছিলেন বঙ্গভাষায় পারঙ্গম স্থানীয় রুশ দূতাবাসের কর্মী ফেলিক্স উর্লভ্, মস্কোর সাংবাদিক সের্গেই খারিন ও লেনিনগ্রাদের কবি ভ্লাদিমির দ্রিয়াগিলেভ এবং এপক্ষে আমরা, আনন্দবাজার-হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সাতজন কর্মী। অন্য দুই রুশী ভারতদর্শনে সম্প্রতি আগত একটি সাংস্কৃতিক দলের সদস্য এবং আমাদের সাতজনের মধ্যে চারজনই মস্কো ফেরতা।

পাসিভা (ধন্যবাদ), খারাশো (ভাল) দাস্ভিদানিয়া (ফির মিলেঙ্গে), নিয়েৎ (না) দা-দা (হাঁ) ইত্যাদি অল্প কয়েকটি রুশী শব্দ আমার পুঁজি। তাক বুঝে ভাঙিয়ে তাক লাগাচ্ছিলুম এবং বঙ্গভাষী রুশী আর রুশ ভাষী বাঙালীদের হাসির খোরাক জোগাচ্ছিলুম। ইতিমধ্যে কবি দ্রিয়াগিলেভ পড়তে শুরু করে দিলেন কলকাতায় এসে লেখা নিজের একটি কবিতা।

কবিতার এক বর্ণও বুঝলাম না। কিন্তু ভাষার গাম্ভীর্যে, স্বরের উদাত্ততায় গোটা আড্ডা গম গম করতে লাগল প্রতিটি পল, প্রতিটি মুহূর্তে। আমরা মুগ্ধবিস্ময়ে কবিকণ্ঠের আবৃত্তি শুনতে লাগলুম।

পরে কবিতাটি বাংলায় অনুবাদ করে দিলেন উর্লভ্। তর্জমার প্রথম কয়েক পঙক্তির মানে দাঁড়ায় এই রকম—

হে ভারত,
আমি মহান লেনিনের শহর

লেলিনগ্রাদ থেকে এসেছি ;
এসেছি তোমার জন্যে শুভেচ্ছা নিয়ে।
আমাদের দুই দেশের মধ্যে
পর্বতের ব্যবধান আর নেই,
আমাদের বন্ধুত্বের উষ্ণতা
তুষার-প্রাচীর গলিয়ে দিয়েছে :
আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি।
হে ভারত,
তোমার অগ্রগতির আমি গুণগ্রাহী
তুমি আমার ভালবাসা গ্রহণ কর।

যোগাযোগ চমৎকার, ঠিক ওই সময়ই আমার কাছে ছিল রুশী একটি গানের কটি লাইন—মস্কো থেকে আমার এক বন্ধুর পাঠানো। দ্রিয়াগিলেভ থামতেই বললুম—"আমিও রুশী কবিতা পড়ব।"

সবাই রাজি। আমি পড়ে যেতে লাগলুম ঃ 'তোল্‌কা কুরান্তি স্তিনিয়ং ভায়াদ্দালেনি, দাভ্‌পার্কা শুনিং লিস্তভা। খারাশো নাম স্তাবোই ইচি"—ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা "শুধু ক্রেমলিনে ধ্বনি প্রহরে প্রহরে পাতারা কুঞ্জে মর্মরে। কী ভালো এই বেড়াই তুমি আমি—"

আমায় থামার ফুরসৎ না দিয়ে সের্গেই খারিন চেঁচিয়ে উঠলেন—"এ কোথায় শিখলেন আপনি? এ যে আমাদের মস্কোর লোকদের প্রিয়তম গান। ঘরে ঘরে সবাই গায়।"

আমি চুপ করে আছি। দ্রিয়াগিলেভ ওদিকে ব্যাঞ্জো বাজানোর ভঙ্গী করে গানটি সুরে গুণগুণ করতে লাগলেন।

তারপর একথা সেকথা। ভারতের কোন্ শহর ভাল লাগল. ওড়িষ্যায় গেলে কোনারক্ যাবেন কিনা, তাঁদের দলে কোন

ব্যালেরিনা নেই কেন, দলে বেশীর ভাগ ডাক্তার-সার্জন কেন, দেশে ফিরছেন কবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কথায় কথায় আলোচনা চলে এল সাম্প্রতিক রুশী কবিতাতে। এবং অনিবার্যভাবে নাম উঠল ইয়েভতুশেংকোর।

নাম শুনে তিন রুশীই নাক সিঁটকালেন। বললেন ঃ—উঁহু, তেমন কিছু না। অরিজিন্যাল কিসসু নেই ছোকরার। শুধু ওপর চালাকী।

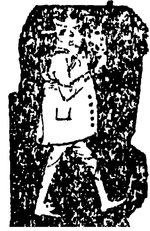
· দ্রিয়াগিলেভ ফোড়ন কাটলেন—"ইয়েভতুশেংকো চেহারায় লম্বা, কিন্তু কবিতায় খাটো।"

সের্গেই খারিন ব্যাপারটার বিশদ ব্যাখ্যা করেন—"আসল কথা কি জানেন, ছোকরার কোন অভিজ্ঞতা নেই জীবন সম্পর্কে। ওর বয়সী ছেলেরা কাজ করে কারখানায়, কলে, খামারে, জানে অনেক কিছু। আর ও কিছুই করেনি। জীবনকে না জেনে কি কবি হওয়া যায়?"

আমাদের একজন প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা মায়াকোভ্স্কী'র কবিতা—"

প্রশ্ন শেষ হল না। মনে হল, নাম শুনেই তিন রুশীর জিব দিয়ে লাল গড়াচ্ছে। এবং তৎক্ষণাৎ তিনজনের কোরাস ঃ "মায়া-কোভ্স্কী? তুলনা হয় না, তুলনা হয় না।"

ওদিকে একঘণ্টা কাবার। ওদের যাবার সময় হয়ে গেছে। আড্ডাও খতম।



সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিতেই মিস্টার অস্টিন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'উঁহু, খাইনে।'

'ক্যানসারের ভয়ে নাকি ?'—আমি ফোড়ন কাটি।

'ঠিকই বলেছেন'—অস্টিন আমার কথা লুফে নেন– 'ক্যানসারে মরতে কে না ভয় পায়।'

সঙ্গী আর একজন সাংবাদিক এগিয়ে এলেন, দিনের সাতাশীতম সিগারেট ছাইদানিতে নিভিয়ে অস্টিনকে বললেন—আপনারা, আমেরিকানরা কী যা' তা' গুজব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন, সিগারেট খাওয়া বন্ধ না করে ছাড়বেন না দেখছি।'

অস্টিন হাসিতে যোগ দিলেন, এবং কথার মোড় ঘুরাতে হাল বাংলার খবরাখবর কী, জানতে চাইলেন।

আসর বসেছে ইউ এস আই এসের ইনফরমেশন অফিসার ফিলিপ ফ্র্যাংক গুল্‌ডের বাড়িতে। ওয়াশিংটন থেকে এসেছেন ইউ এস আই এ'র মিস্টার এডওয়ার্ড ও'নীল। তাঁর সঙ্গে কলকাতার সাংবাদিককে আলাপ করিয়ে দিতে গুল্‌ড-দম্পতী ডেকেছেন আমাদের মত কয়েকজনকে। এইখানেই অনেকদিন পর দেখা ইউ এস আই এসের স্থানীয় বড়কর্তা মিস্টার অস্টিনের সঙ্গে।

আরও এসেছেন অনেকে। মার্কিন বার্তাবিভাগের নতুন প্রেস

অফিসার মিস্টার ক্ল্যাথান রস, মাইকেল স্নাইডার প্রভৃতি। নরম গরম পানীয় হাতে নিয়ে কখনও বড়দল, কখনও ঘরের কোনে-কোনে ছোট ছোট দল, আর এক প্রসঙ্গের পর অন্য প্রসঙ্গ। ক্যানসার থেকে পূর্ব পাকিস্তানের হাঙ্গামা, হাঙ্গামা থেকে সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাশ্মীর বিতর্ক, কাশ্মীর থেকে আকাশবাণী—ভয়েস অব আমেরিকা চুক্তি। গলার স্বর কখনও উত্তেজিত, কখনও ঠাণ্ডা। এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে গুল্ড্-গৃহিণী এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছেন। অতিথিদের উপরন্তু মিলছে যখন তখন তাঁর মিষ্টিহাসির আপ্যায়ন।

মিসিস গুল্ড্ স্বামীর সঙ্গে নূতন এসেছেন কলকাতায়। বললুম—'কেমন লাগছে আমাদের শহর?' অনিবার্য জবাবটি এল—'ফাইন। এই সময়ের আবহাওয়া আর কদিন থাকবে বলুনতো?'

'সুখের দিন হল যে অবসান'—আবার বললুম—'তৈরী হোন, ভয়ঙ্কর দিন আসছে। আসছে প্রখর তপনতাপের হাহাকার।'

সদা-হাসিখুশী মিস্টার গুল্ড্ এসে যোগ দিলেন। বললেন—'আমরাতো সেই ভয়ঙ্কর দিনের অপেক্ষাতেই আছি। আসার পর থেকে কলকাতার গরমের কথা হরদম শুনছি, এবার হাতেনাতে তাকে পরখ করতে চাই।'

মিসিস গুল্ডের চোখে-মুখে ভবিষ্যতের সেই কঠিন কালো ছায়া। দু'হাত নেড়ে বলেন—"গরম হাওয়া, দরদর ঘাম ঝরছে, সারাক্ষণ আইঢাই, পথে বেরোলে চামড়া পুড়ে যায়—ফ্যাসিনেটিং—উফ্ কবে যে আসবে সেদিন—

মিসিসের উচ্ছাসে আমি বাধা দিইনা। তবে ইচ্ছে আছে গরমটা তেড়ে পড়লে একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাব।

* * * *

এককোণে বসেছিলেন ক্ল্যাথান রস। গোবেচারী ভাল মানুষ চেহারা। কথা বলেন কম, যা বলেন, তা'ও আস্তে। জাতিতে

নিগ্রো, এখানে আসার আগে ছিলেন নর্থ ক্যারোলিনার এক নিগ্রো কাগজের বার্তা-সম্পাদক। সম্ভবত কলকাতার মার্কিন বার্তালয়ে তিনিই প্রথম নিগ্রো অফিসার।

রসের পাশেই মাইকেল স্নাইডার। তিনি আমার কাছে পরম বিস্ময়। এবং তাঁর গুণের পরিচয় পেয়ে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ইংরেজি বলার হাত থেকে বেঁচে গেলুম।

স্নাইডারও এই শহরে নবাগত। কিন্তু মাত্র সাত-আট মাসে তিনি চমৎকার বাংলা শিখে গেছেন। পরিস্কার উচ্চারণ, বাক্য-গঠন নিখুঁত। বললুম—'এত অল্প সময়ে বাংলা শিখলেন কী করে?

'মোটেই কঠিন নয় আপনাদের ভাষা'—স্নাইডার বলেন—'তাছাড়া আমি দিনে পাঁচঘণ্টা বাংলাভাষার চর্চা করি।'

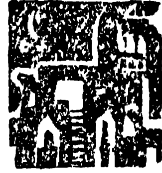
অবাক মানলুম। এবং অতঃপর তাঁর বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অজস্র কৌতূহল মেটানোর ভার আমাকে নিতে হল। ক্ষীণতনু এই সহৃদয় মার্কিনীর এই ভার আমি সানন্দেই গ্রহণ করলুম।

দেখলুম, তাঁর বেশী আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নিয়ে। জানালেন, এখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে মেতেছেন। আরও জানালেন পড়ে ভালই লাগছে।

প্রায় একঘণ্টা স্নাইডারের সঙ্গে নানান রকম কথা। হঠাৎ মনে হল, আমি ভীষণ অভদ্রতা করে ফেলছি। আসরের মূল সুর থেকে আমরা দূরে সরে গেছি। এই ধরনের নিমন্ত্রণে দ্বৈত-সঙ্গীতের স্থান নেই, সব সম্মেলক।

অগত্যা আমাদের ভাষা চর্চা মুলতুবী রাখতে হল। দু'জনেই ভিড়ে গেলুম ঘরের মাঝখানের হাসিঠাট্টার গুরুগম্ভীর আলোচনায়। সেখানে কেন্দ্রমণি প্রধান অতিথি ও'নীল।

মিসিস গুলড্ আবার খাবারের থালি নিয়ে হাসিমুখে সামনে দাঁড়িয়েছেন। আসরের আলাপ এগোতে লাগল দুনে, চৌদুনে।



সৈয়দবাবার দরগা

হঠাৎ আজানের ডাক শুনে চমকে যাবেন না। কিংবা হঠাৎ সাত আটশো পায়রা গাছের শাখা থেকে উড়তে শুরু করলে। এইখানেই সৈয়দবাবার দরগা। ঐ যে দরগা ঘিরে কী যেন ঝুলছে সারি সারি। ওগুলো উটপাখির ডিম।

হজরত সৈয়দ আলী শাহর দেশ ছিল আরব মুলুক। মুসলমানরা যখন দিল্লির বাদশাহ, তখন তিনি আসেন হিন্দুস্থানে। তারপর শতাধিক বর্ষের পুণ্য জীবন সমাপ্ত করে আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন এইখানে—এই ঝুরিনামা শান্তশীতল বটের তলায়। খিদিরপুর পুলের কাছে হেস্‌টিংস ময়দানে।

সামনেই গড়গড় করে চলেছে খিদিরপুর, বেহালার ট্রাম। ট্রাম লাইনের ঐ পারে রেসকোর্স। শনি রবিতে হাজার হাজার টাকার খেলা। গাড়ির ভিড়। লোকের ঠেলাঠেলি। ডাইনে বাঁয়ে মিলিটারির গুদাম। পিছনে বস্তি। আর উথালপাতাল জনসমুদ্রের মাঝখানে হেস্‌টিংস ময়দানে দ্বীপের মতন দাঁড়িয়ে আছে শান্তি আর পবিত্রতায় ঘেরা সৈয়দবাবার দরগা। রাজপথে কান পাতলে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে এই দরগা থেকেই সকাল সন্ধ্যা শোনা যায় আজানের ডাক।

কলকাতায় মন্দির মসজিদের কমতি নেই। কিন্তু সৈয়দবাবার এই দরগা অনেকের হয়তো নজরে পড়ে না। 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আলয়, নিরাড়ম্বর পবিত্রভূমি পথ-চল্‌তি লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি নজরে পড়ে, দু'দণ্ডের জন্যেও আপনাকে এইখানে থামতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে দরগার দিকে। এমন চমৎকার জায়গা কলকাতায় বড় বেশী নেই। ট্রাম-স্টপ থেকে কয়েক পা এগিয়েই সবুজ ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট মাঠ। এককোণে ঝুরিনামা অতিবৃদ্ধ অতিকায় বট। তার তলায় শুয়ে আছে ক্লান্ত পথিক, একতারাতে গুণগুণোচ্ছে কোন বৈরাগী। কিংবা নামাজ পড়ছে কেউ। আর পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাত আটশ' পায়রা। বটগাছের কোলেই তাদের আস্তানা। সবই বাবার নামে মানত করা। পুণ্যকামীরা এসে এসে এদের রোজ খাইয়ে যায়।

আরও একটু এগোলেই দেখবেন বাবার কবর। একপাশে 'জেনানাকে লিয়ে' বিশ্রামঘর। অন্যপাশে মর্মর চত্বরে ঘেরা কবরস্থান। বাবা শুয়ে আছেন উত্তর দিকে মাথা রেখে। বাবার ইচ্ছেতেই কবরের ওপর শুধু মাটির প্রলেপ। ভক্তেরা, পুণ্যকামীরা রোজ ফুল দিয়ে যান। কবরের চারধারে নূতন তৈরী মর্মর বেদী, তোরণ। তার গায়ে কোরানের বাণী খোদাই করা। সেখানে অসংখ্য লোকের অবিরাম আসা-যাওয়া। হাতজোড় করে সকলেই চাইছে বাবার 'দোয়া'।

কবরের চারধারে ঝুলছে সারি সারি উটপাখির ডিম। জাহাজীরা বিদেশ থেকে ফিরেই সটান চলে আসেন দরগায়। তাঁরাই ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে ঐ ডিম। এক পাশে নামাজের জায়গা, অন্যপাশে মোহাফিজের থাকার ঘর। ধূপের গন্ধ আর ফুলের সৌরভের মাঝখান থেকে সরে যেতে আপনার ইচ্ছে করে না।

দরগার মোহাফিজ সুলতান আহাম্মদ। তাঁর বাবাও ছিলেন মোহাফিজ। তাদের বাড়ি ছিল গাজীপুরে। এখন কলকাতার লোক। সুলতান সাহেব একগাল হেসে বললেন—“বাবুজী, সৈয়দ-বাবার মতোন এমুন রাগী আদমী বহুৎ কম আছে। বাবার নামে কুছু খারাপ কথা বলছেন তো জান খতম। আর বাবার দোয়া হলো তো কাম হাসিল।

এই দেখুন না, গত লড়াইয়ের সময় মিলিটারী আদমীরা একরোজ এসে বলল—‘দরগা উঠাও।’ হামরা বললাম, ‘কভি নেহি।’ চলল হাঙ্গামা হুজ্জুত। বড়ি গোলমাল। হামরা সাফ জানিয়ে দিলাম—বাবার কবর উঠবে নাই। জান কবুল।

মিলিটারী আদমীরা রোজ রোজ হুজ্জুত করে। দরগায় ঢুকে হাল্লা করে। হামারা নামাজ পড়ি, কাওয়ালী গাই, আজান দিই। উরা বলে—‘উসব চলবে নাই।’ মহা মুসকিল। লেকিন সব ফয়সালা করে দিলেন খোদ ‘বাবা’।

এক রোজ হয়েছে কি, এক হাওয়াই জাহাজ দরগার উপরে উড়বার সময় বদাম্ করে গিরে গেল। আগুনে আগুনে সব কাবার। হামরা সমঝালাম, ঠিক হয়েছে, বাবা গোসা দেখিয়েছেন। তারপর হামরা মিলিটারী আদমীদের কাছে গেলাম, ধরাধরি করলাম। বললাম, ‘হুজুর, বাবাকে শান্তিতে থাকতে দেন।’ উরা রাজী হয়ে গেল। তারপর কুছ গোলমাল নাই।

“এখুন হিন্দু, মুছলমান, খিরিস্তান সব লোক আসে, সিন্নি দেয়, মানত করে। সিন্নিখরচে হামাদের চার-পাঁচ আদমীর পেট চলে।”

আমি জানতে চাইলাম বাবার জীবন-ইতিহাস। মোহাফিজের বক্তব্যে সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা হল না। শুধু অসংখ্য কিংবদন্তী আর অলৌকিক কাহিনী। মোহাফিজ স্বীকার করলেন, বাবার ঠিক ঠিক ইতিহাস তাঁদের কারও জানা নেই। শুধু জানেন,

আরব মুলুক থেকে এসে হিন্দুস্থান ঘুরতে ঘুরতে তিনি আসেন এই বাংলা মুলুক। মারাও গেলেন এইখানে। বাবা বেঁচেছিলেন একশ বছরের বেশী। মারা যান ১১১৭ হিজরীতে। এখন ১৩৭৯ হিজরী।

প্রতি হপ্তায় বৃহস্পতিবারে বৃহস্পতিবারে দরগার সামনের মাঠে মেলা বসে। বৃহস্পতিবার মানত দেবার, সিন্নি দেবার দিন। তাছাড়া নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতি বছর দুদিন ধরে বসে খুব বড় মেলা। বাবার উরস্। ২৬এ ও ২৭এ জমাদিওল আউল তারিখে। এইদিন একেবারে মহোৎসব।

বিদায় নেবার আগে সুলতানসাহেব বললেন—আদাব বাবুজী, আসবেন আবার। ওদিকে তখন সন্ধ্যের আজান শুরু হয়ে গেছে।



রামনিবাস মাহাতো

রামনিবাস মাহাতোকে আপনারা চিনতে না পারেন, ছাপরা জেলার কুসমি গ্রামের সবাই চেনে। কুসমি গ্রাম কতদূর—আ-রি বা-প-, বহুৎ দূর, টেরেনমে চড়্‌নেভি কমসে কম এক রাত দো দিন।'

ছাপরা-দ্বারভাঙা জেলার কয়েক হাজার লোক আছে এই কলকাতায়। দিনমজুর খাটে, রিক্সা টানে, দুধ বেচে। আর 'মনি-অরডর্' করে 'জরুর' কাছে মাস মাস 'রূপিয়া ভেজে'। মাঝে মাঝে 'মুলুক' যায়। এখানে এরা ফুটপাতে দিন কাটায়, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, আর ওইদিকে দেশে জমির পরিমাণ বাড়ে। শেষ বয়সে ফের 'মুলুক'। নাতি-নাতনি নিয়ে তেঁতুল গাছের ছায়ায় 'চারপাই' পেতে ফুড়ুক ফুড়ুক তামাক টানা আর দেশোয়ালী

ভাইদের সঙ্গে 'ভারী শাহার কলকাত্তার আজীব কহানী'র আলোচনা।

রামনিবাস তাদের ব্যতিক্রম।—'কতদিন দেশে যাওনি রামনিবাস ?—

—'তা বাবুজী, অনেক বরষ হোবে ?'

ট্রামে যেতে আসতে রামনিবাসকে প্রায়ই দেখতাম। মনুমেণ্টের পাশে ফাঁকা ময়দানে সে 'দিনমজুরের হোটেল' খুলে বসেছে। ষাটের ওপর বয়স, খালি গা, ঠোঁটের ডগায় ইয়া গোঁফ। অকালসূর্যের মত ঝকঝক করা এক সার থালা আর এক সার ঘটি। পাশেই জলের ড্রাম। বস্তার উপর দাঁড়িপাল্লা হাতে বসে আছে রামনিবাস। সামনে ছাতুর ঝুড়ি।

বারোটা বাজতে না বাজতেই আসে ঝাঁকামুটে। আসে ঠেলাওয়ালা। ঐ সামনে, উঁচুতে দাঁড়িয়ে গ্র্যাণ্ড হোটেলের গায়ে যারা সাদা রঙের পোচ লাগাচ্ছে, তাদের কেউ কেউও আসে।

দিনমজুরের দল হাতমুখ ধুয়ে পেতলের থালা বাড়িয়ে দেয়। এক টাকা সেরের ছাতু এক পো দেড় পো থালায় পড়ে। জলে-ছাতুতে ডলাইমলাই। জোয়ান বয়সী এক ছেলে জল ঢেলে দেয়, 'পেঁয়াজ—ইমলি—মিরচাই' এগিয়ে দেয়, 'বর্তনের' মত ঐসবও 'ফিরি'। ছাতুর ডেলা, আর ঢক ঢক এক ঘটি জল। ব্যস, হয়ে গেল দুপুরবেলার উপাদেয় 'লাঞ্চ'।

এগারো-বারোটা থেকে তিনটে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত 'হোটেল' চলে। তারপর আবার যে-কে-সেই। দিনমজুরেরা চলে যায়, ছাতুওয়ালাও ছাতুর ঝুড়ি, বাসন ড্রাম মাথায় চাপিয়ে চলে যায়। কোন বস্তিবাড়ির কুঠরীতে, অলিগলির আস্তানায়। এই চলছে রোজ।

একটি দু'টি নয়, এমনি অসংখ্য 'ছাতুর হোটেল' ছড়িয়ে আছে

কলকাতায়। পার্কে, ময়দানে, গাছের তলায়, ফাঁকা জায়গায়। হাজার হাজার দিনমজুর এমনি সারছে প্রতিদিনের লাঞ্চ। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

রামনিবাসের সঙ্গে কী করে আলাপ, সে কাহিনী অবান্তর। আমার গরজে যে-পরিচয়ের শুরু, তাই দাঁড়িয়েছে হৃদ্যতায়। ছাতুমাখা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে রামনিবাস বলে—'চউদ বরষ' এই মাফিক চলছে বাবুজী। হর্‌রোজ পচাঁশ পাঁচ্‌পান আদমি ছাতু লিতে আসে। 'রাঁমজী-র কিরপায়' দিন চলে যায়।

একদিন জিগগেস করি—'সঙ্গের ছেলেটি কে? লেড়কা নাকি?'

—'নহী বাবুজী, ভাতিজা'—রামনিবাস জবাব দেয়।

'বাড়িতে কে কে আছে তোমার?'

'ওসব বাৎ ছেড়ে দিন বাবুজী, দুসরা বাৎ বলুন।'—কেমন যেন অস্বস্তির সঙ্গে সে আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। খানিক থেমে আবার বলে—"মুলুকমে জমিজেরাত, বয়েলগরু সব কুছু ছিল, লেকিন—" রামনিবাস কিছু একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে যায়। শুকনো হাসি হাসে।

অন্য আর একদিন। বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে। মার্চের সূর্য রৌদ্রের কলস উপুড় করে ঢালছে। ময়দানে জনবিরল! শুধু ট্রামের ঘড়ঘড়ানি আর ঐ কোণ থেকে ভেসে আসা ডুগডুগির বাজনা। হয়ত কেউ ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছে। রামনিবাস তার 'হোটেল' গুটোচ্ছে। সঙ্গের লোকটা ড্রাম আর বাসন-কোসন নিয়ে এইমাত্র চলে গেল। একথা সেকথার পর রামনিবাস আজ নিজেই বলতে শুরু করে দিল।

'নসীব বাবুজী, সব নসীব। নসীব না হোবে তো, রামনিবাস কেনো কলকাত্তায় আসবে, আউর ছাতু বর্তন লিয়ে কেনো ময়দানে বোসবে।—সব গোলমাল হোয়ে গেল বাবুজী'—

আমার অনুনয়ে সেদিন তার মুখ দিয়ে যে কাহিনী বেরোল, তাতে এই 'ছাতুওয়ালা' রামনিবাসকে মনে হল আমার অচেনা। মনে হল সে এক অন্য মানুষ—যাকে আমি এই প্রথম দেখলাম।

বছর তিরিশ আগেকার কথা। রামনিবাস তখন কুসমি গাঁয়ের জোয়ান ছেলে। মা-বাপ নেই, খায় দায়, ঢোলক বাজায় আর সকাল সন্ধ্যে মাঠে লাঙল চালায়। দিন কাটে ফুর্তিতে। রামনিবাস হঠাৎ একদিন 'শাদী' করে নিয়ে এল পাশের গাঁয়ের এক মেয়েকে। 'খুবসুরৎ' বৌ। সুখের জীবন চৌহুনে চলল। কিন্তু রামনিবাসের 'সাজানো বাগান' শুকিয়ে যেতেও বেশিদিন লাগল না। সেইখানেই কাজ করল সেই 'নসীব'।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই 'এক লড়কা' এল ঘরে। ছেলে বড় হল। বৌয়ের শখ, ঢোলক বাজানো নয়, লাঙল চালানো নয়, ছেলেকে 'লিখাপড়ি' করাবে। রামনিবাস বলল—'ঠিক বাৎ', লড়কা নোকরী কোরবে, ফটফট্ 'ইঞ্জিরি' বোলবে, গড়গড় কিতাব পোড়বে। বহুৎ আচ্ছা।'

ছেলে ভর্তি হয়ে গেল। মিশিরজীর পাঠশালায়। গাঁয়ের ভেতরেই বটগাছের তলায় পাঠশালা।

ছেলেকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর আহ্লাদের অন্ত নেই। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। একদিনের 'বুখারে' সেই ছেলে মারা গেল। 'দাওয়াই' খাওয়াবার সময় পর্যন্ত হল না। স্বামী-স্ত্রী ছেলের শোকে পাগল। এমন সময় মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। রামনিবাসের বৌও সেই জ্বরে মারা গেল। এক 'খারাব বেমারী' গাঁয়ের বাড়িতে বাড়িতে হানা দিতে লাগল। রামনিবাসের ঘর খালি। মন খালি।

'ধুৎ তেরি' বলে একদিন রাত্রে সে বেরিয়ে পড়ল। চলে গেল 'বালিয়া জিল্লা'। সেখান থেকে মজঃফরপুর।—রেলকম্পানিমে

চাকরি নিল। কিন্তু মন টিকল না। ফের নিজের গাঁয়ে কুসমিতে। মনের হাহাকার আরও বেড়ে গেল। ঐ সময় 'কলকাত্তা রহনেওয়ালা' এক দেশোয়ালী ভাই কুসমিতে এসেছিল। তার পরামর্শে রামনিবাসও চলে এল কলকাতায়। গাড়ি ঘোড়া, টেরাম, বাত্তি, দালান বাড়ি—আ-রে বা-প্, আজীব শহর।

কত বছর আগেকার কথা। সেই প্রথমদিনের স্মৃতি এখনও রামনিবাসের মনে উজ্জ্বল। উঠল মানিকতলার এক বস্তিতে। দেশোয়ালী ভাইদের সঙ্গে। গোড়ায় নিল দিনমজুরের কাজ। ভাল লাগল না। কাজ ছেড়ে দিল। মন পড়ে আছে কুসমিতে।

কয়েকমাসের পর 'নোকরি' নিল এক 'বাঙালী বাবুর' বাড়িতে। সেখানে ছিল বছর দুই। কিছু টাকা জমল। 'নোকরি ছেড়ে' আবার দিনমজুরের কাজ। খরচ কম, রোজগার মন্দ নয়। অনেক টাকা জমে গেল রামনিবাসের হাতে। সেই টাকা দিয়েই এই ছাতুর কারবার—আজ চৌদ্দ বছর ধরে চলছে। একলা মানুষ। জমা টাকার অঙ্ক বাড়ছে।

অনেক টাকা সঙ্গে নিয়ে বহুদিন পর রামনিবাস গেল কুসমি। বৌ আর ছেলের স্মৃতিতে চোখ ঝাপসা মন উদাস। একদিন পাড়ায় বেড়াতে বেরিয়ে দেখে সেই বটতলায় মিশিরজীর পাঠশালা। এখনও চলছে। তাঁর 'লড়কার মত অনেক বাচ্চা ছেলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বই পড়ছে। বউয়ের কথা মনে পড়ল—'লড়কা লিখাপড়ি শিখবে, নোকরী করবে।'—কিন্তু কোথায় সেই ছেলে?

রামনিবাস মনে মনে তার সংকল্প ঠিক করে ফেলল। বাড়ি বিক্রি করে দিল। মিশিরজী আর গাঁয়ের মাতব্বর পাঁচজনকে ডেকে বলল—গাছতলায় ক্লাশ চলবে না। বাড়ি বানাও, 'রুপিয়া হম দেঙ্গে'।

যে কথা সেই কাজ, পাঠশালার বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেল। ধন্য ধন্য পড়ে গেল রামনিবাসের।

ফিরে এল কলকাতায়। আবার সেই ছাতু বিক্রির কাজ। সঙ্গে নিয়ে এল এক ভাইপোকে। কারবার পুরোদমে চলে।

কুসমি গ্রামে আর যায়নি রামনিবাস। এখান থেকেই আরও কয়েকবার কিছু টাকা কুসমিতে পাঠিয়েছে। পাঠশালার ছেলেদের বই শ্লেট কিনে দেবার জন্যে। কুসমিতে যাবার ইচ্ছেও নেই। গিয়ে লাভই বা কী? সেই তো ছেলেটার কথা, বৌয়ের কথা বেশী করে মনে পড়ানো। এখানে ভিড়ের মাঝখানে যেমন চলছে, চলুক। গাঁয়ের 'লড়কা বাচ্চারা' আরামসে 'লিখাপড়ি' করছে। বটগাছের তলায় আর রোদে কষ্ট পাচ্ছে না,—ভাবতেই ভাল লাগে।

একনাগাড়ে অনেক কথা বলার পর রামনিবাস হাঁপিয়ে ওঠে। তারপর হঠাৎ হক্‌চকিয়ে বলে—'ঝুটমুট ঐ সোব ফালতু বাৎ বোললাম। আচ্ছা বাবুজী নমস্তে।'

রামনিবাস চলে গিয়েছে। আমার মন তখন এখানে নয় ছাপরা জেলার কুসমিগ্রামের সেই বটগাছের তলায়। আচ্ছা, ঐ যে ছাতুর ঝুড়ি মাথায় নিয়ে খিদিরপুরের দিকে যে চলে যাচ্ছে, এ কোন রামনিবাস?



ময়দান

ভোরের ময়দানে গিয়েছেন কখনও ? না গিয়ে থাকলে আপনার নগরদর্শনের বারোআনাই বাকী। লেপ-কম্বলের মায়া কাটিয়ে যদি কোনদিন ঐ অতিকায় সবুজ-দৈত্যের বুকে পাড়ি দিতে পারেন, দেখবেন কুয়াশার লেপ মুড়ি দিয়ে সে তখন গায়ের আড়ামোড়া ভাঙছে। রেসকোর্স, ট্রামলাইন, খেলার মাঠ, গঙ্গার ঘাট, কোথাও তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি।

এক ঝাঁক হিমেল হাওয়ার ঝাপটা খেয়ে হঠাৎ দেখবেন খবরের কাগজের পাহাড় চাপিয়ে সারবাঁধা সাইকেল তীরের মত ছুটে চলেছে। অন্য পাশে প্যাডেলের ডানা ঝাপটিয়ে আর এক ঝাঁক সাইকেল। খবরের কাগজের হকার নয়, ওরা খেলোয়াড়। ওদের পেছন পেছন গেঞ্জি-হাফপ্যাণ্ট পরে যারা দৌড়চ্ছে তারাও। আসন্ন কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মহড়া নিয়মিত এই ভোরবেলা-কার ময়দানে।

সময় গড়াতেই দাঁড়িয়ে পড়বে গাড়ির পর গাড়ি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ব্রিগেড-প্যারেড-গ্রাউণ্ড, গড় উইলিয়মের পাশে। গাড়ি থেকে নামবেন বিপুলবপু মাড়োয়ারী, দৈর্ঘপ্রস্থে সমান-টানা গৃহিণী এবং ক্ষীণকায়া তস্য কন্যা। নেমেই হনহন করে ওরা ছুটে চলবেন। এঁরা স্বাস্থ্যবিলাসী।

নির্মল 'ওজন' ফুসফুসে পুরতে 'শহর কলকাতার ফুসফুস' এই ময়দানে এঁরা রোজই আসেন। কানে-গলায় কম্ফর্টার জড়ানো, ফুলমোজা পম্প-শু্য পরা যে দু'জন পেন্সনভোগী কচিসংসদের নকুড়মামার মত বেঞ্চিতে বসে আছেন, এঁরাও স্বাস্থ্যবিলাসী। প্রাতর্ভ্রমণের শেষে একটু দম নিতে বসেছেন। সেই ফাঁকে চলেছে খুচরো আলাপ। ছেলের প্রমোশন, মেয়ের বিয়ে, নতুন কোন কবিরাজী ওষুধের কথা। তাঁদের সমুখ দিয়ে চলে যাচ্ছে টগবগ চালের কোন ঘোড়সওয়ার। কিংবা কোন দৌড়বাজ।

বাঁ দিকে খোলা মাঠে গল্‌ফ কোর্সের পাশে বসেছে যোগশিক্ষার আসর। নানান্ রকম আসন আর প্রাণায়ামের কসরৎ। শিক্ষার্থী অনেক। আপনি যখন যোগচর্চার কৌশলে প্রায় তন্ময়, তখন হঠাৎ কানে যাবে বাজখাঁই কণ্ঠের 'অ্যাটেন্‌সন্' চীৎকার। ঐ দিকটায় খাকিপোষাকী এন. সি. সির প্যারেড ততক্ষনে শুরু হয়ে গেছে।

মনুমেণ্টের তলা ঠাণ্ডা, ট্রামগুমটি ঠাণ্ডা। পিচের রাস্তাগুলোও নির্জীব সাপের মত শুয়ে আছে। চৌরাস্তার মোড়ে বসছে খবরের কাগজের আড়ত। মেট্রো-গ্র্যাণ্ডের ফুটপাতে, ট্র্যামগুমটির তলায় ঘুমকাতুরে ভবঘুরের ভিড়। রিক্সার ভেতরে চিংড়িকুঁকড়ি মেরে রিক্সাওয়ালা। ঝাঁকামুটেও ঝাঁকার ভেতর বর্তুলাকার। কোন ক্লাব-তাঁবুর মালী, কিংবা কোন অফিস-বাড়ির দারোয়ান পৈতে কানে দাঁতন করতে নেমেছে মনোহরদাস তড়াগে। উত্তরের দিকে ছুটে গেল পর পর দু'খানা ট্যাক্সি। ভোরের প্লেন ধরতে হয়ত দম দমেই।

রাজভবনের দক্ষিণ দিকে শহীদস্তম্ভের দু'পাশে রাইফেলধারী সেনা যুগল যেন আরও বিষণ্ণ, আরও গম্ভীর। দু'একটা কাক উড়তে শুরু করেছে। ইডেন মাঠের রিক্তশাখা বটের ডগায় তিন চারটে শালিক। সামনেই গঙ্গা।

এমন সময় হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ জাহাজের মাস্তুল রাঙিয়ে 'দীপ্ত হইল সুপ্রভাত তরুণারুণ রাগে। গোটা ময়দান চঞ্চল। 'কার পদ-পরশন আশা, তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা।' কুয়াশার পর্দা সরিয়ে ছুটে এল বেহালার ট্রাম। মনুমেন্টের পাশের বাসস্ট্যাণ্ডে শোনা গেল মোটর ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ চীৎকার। সূর্যকরোজ্জ্বল ময়দানের প্রথম অঙ্ক শেষ। আবার গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়; আবার ব্যস্ততার পালা।

বেলা বাড়তেই ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের আসা যাওয়া—সারাদিন ময়দানবী কারবার। কিন্তু বহুরূপী ময়দান ক্ষণে ক্ষণে চেহারা পালটায়। সে 'দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী।' দুপুর গড়াতেই তার অন্য রূপ। খিদিরপুর টামলাইনের দু'ধারে গড় উইলিয়ামের কোল-ঘেঁষা সবুজ কার্পেটের বুকে গল্‌ফ্‌ খেলে যখন অতি সংক্ষিপ্ত স্কার্টের বিপুল-বপু বিদেশিনী বাড়ি ফিরতে তৈরী, তখন বিভিন্ন ক্লাবের মাঠে মাঠে চলছে হকি বা ফুটবলের তোড়জোড়। দুপুরের খাঁ খাঁ রোদ গঙ্গার ওপারে ঢলে পড়তে না পড়তেই মনুমেন্টের তলা থেকে চলে যায় ছাতুওয়ালা। একটু আগেই ঐ জায়গাটিতে বসেছিল ছাতুর হোটেল। লংকা-তেঁতুলের চাট দিয়ে এইখানেই ঠেলাওয়ালা, ঝাঁকামুটে, দিনমজুরের দল সেরে গেছে ছাতুর ডেলার মধ্যাহ্ণ ভোজন। ছোলার দানা খুঁটে খুঁটে খাওয়া কবুতরের দলও ঝাঁক বেঁধে বেপাত্তা। মনুমেন্টের তলায় কারা যেন এইমাত্র পুঁতে গেছে লাল ঝাণ্ডা। লোক জমেছে দু'চারজন। ওদিকে ঢোলক বাজিয়ে 'রামধুনের' আসর, গোলকরে বসা মুগ্ধশ্রোতার মাঝখানে কে যেন পড়ছে তুলসীদাসী রামায়ণ। বেদেনী মেয়েটা দেখাচ্ছে ভানুমতীর খেল। গামছাপরা বাচ্চা ছেলেটা ডিগবাজি খেতে খেতে দেখিয়ে চলেছে দেহের কসরত।

দাঁতের মাজন, দাদের মলমের বিজ্ঞাপন দিতে কারা যেন রঙচটা ভাঙা হারমোনিয়ামের সঙ্গে জুড়েছে খনখনে গলার গান। এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছে বেকার যুবকের দল।

চারদিকে ভিড় আর ভিড়। শীতের রোদ্দুরে পিঠ এলিয়ে কিংবা কাঁধের গামছা ঘাসে ভিজিয়ে যারা হাইকোর্ট রাজভবনের চূড়ো দেখছিল, তারাও মিশে গেছে এই ভিড়ে এবং দেখতে দেখতে এসে গেছে রিক্সাওয়ালা, কুলি কামিন, হাজার জাতের দিন মজুর।

আজ বোধহয় কোন 'বিরাট জনসভা' নেই। আজ ছোট্ট একটা শ্রোতার দল, বক্তার দল সমান সমান। মনুমেণ্টের ঠিক পেছন দিকে মেহেদি-ছোপানো দাড়িতে ভরা এক বুড়ো মুসলমান খুলেছে 'ইউনানি দাওয়াখানা।' মাদুরের ওপর বিছানো আছে নানান রকম গাছগাছড়া। কোন ওষুধ ক্রিমির, কোনটা 'বুখার' কমায়, কোনটা আবার 'শির-দর্দ' বিলকুল তাড়িয়ে দেয়।

তারই পাশে একটি আদিম 'সার্জিকেল থিয়েটার'। দেহাতী একজন 'সার্জন' জ্বলন্ত কয়লায় ঠাসা এক উনুন নিয়ে বসেছে। আর বসেছে দাঁতের ব্যাথায় কাতর অন্য দেহাতী। রোগীর মুখে তামাক খাওয়ার বড় ছিলিম উল্টো করে বসানো। 'সার্জন' লোহার ডাণ্ডা উনুনে গরম করে এবং তাতে কী একটা গুঁড়ো মশলা মিশিয়ে ছিলিমের একদিকে গুঁজে দিচ্ছে। অন্য দিকে ধোঁয়ায় চোখ ধাঁধানো রোগী খোলা মুখ দিয়ে শ্বাস ফেলেই চলেছে। নীচে কড়াইয়ের ভেতর টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ছে লালা। মিনিট দশেকের মধ্যেই দাতের পোকা বেমালুম সাফ। ব্যথাও খতম।

সার্জনের ঠিক পেছনটাতেই এক অন্ধ গাইয়ে কী একটা তারের যন্ত্র বাজিয়ে গান ধরেছে। কাওয়ালী গান। তার সঙ্গে ধুয়া ধরতে বসে আছে দুটি মেয়ে। এবং গানের তালে তালে হাত তালি দিয়েই চলেছে গোল করে বসা সমঝদার শ্রোতার দল।

'সাড়ে ছ' আনার' হরেকরকম জিনিস নিয়ে বসেছে কয়েকজন দোকানী। ভোজরাজার দিব্যি দিয়ে যাতুবিদ্যে দেখাচ্ছে বেদে আর বেদেনী। মড়ার খুলি ছুঁতে না ছুঁতেই এক টাকার নোট, জোড়া-কবুতর।

প্রত্যেকের সামনেই লম্বা একখানা গামছা পাতা। তাতে পড়ছে এক নয়া পয়সা থেকে পাঁচ দশ, চারি আনি। মেলা জমে উঠেছে। কিন্তু লক্ষ্য করার জিনিস অন্য জায়গায়। চীনের ভারত আক্রমণ এই ময়দান-মেলাতেও ঢিল ছুঁড়েছে। এখানকার গাইয়ে আর চারণ কবিদের গানের ভাষায় আজ দেশের হুর্দিনের কথা।

টের পেলাম রামায়ণ গানের আসরে। মাইক লাগিয়ে বিরাট আসর বসেছে একটি তাঁবুর গায়ে। গাঁদাফুলে সাজানো মঞ্চে ঠায় বসে আছেন রাম-সীতা আর বজ্‌রিংবল্লীজী। সেই ফটোর নীচেই কৌটাকাটা কথক ঠাকুর। আর চারধারে গোল হয়ে বসেছে রামগতপ্রাণ হাজার খানেক ভক্তশ্রোতা। পূজারী বামুন বাতাসার প্রসাদ বিনামূল্যে বিলিয়ে চলেছেন এবং লাউডস্পীকারে ভেসে আসছে রামায়ণ গানের সুর। ফাঁকে ফাঁকে পদের ব্যাখ্যান।

সেই ব্যাখ্যানই ইদানিংকালের উপমা। সেতুবন্ধের কথা বলতে গিয়ে চলে আসছে জাতীয় সংহতি। রাক্ষসকুলের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে হানাদার চীনেদের।

কেউ কেউ আবার এ আসর ছেড়ে অন্য আসরে চলে যায়। লক্ষ্য করলাম, বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এক আধপাগলা বুড়ো। ফোকলা দাঁত, পরণে লুঙ্গী, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া।

উঁকি মারকেই তেলচুকচুকে গোঁফওয়ালা পাশের লোকটি বললে—"আচ্ছা গানা গাতা ইয়ে আদমি।"

হাতে 'খটখটি' আর পায়ে ঘুঙুরপরা ওই লোকটি চক্রাকারে চারবার নেচে হঠাৎ চেঁচালে—'বাংলা, না হিন্দী?

জনতা পাল্টা চিৎকার দিল—'পহেলে বাংলা, উসকে বাদ হিন্দী।'

সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাষ্ঠযন্ত্রে খটাখটি আওয়াজ। এবং লোকটি খোনা গলায় গান ধরলে—

সজনী, বিষম যাতনা।
ডাণ্ডা খাব, গুলি খাব
চীন-গোলামী করব না॥

এক কলি গেয়ে থামে, হাতের খটখটি বাজায় এবং জনতা মদৎ দেয়—'বহুৎ আচ্ছা।' সে আবার গান ধরে—

অনাসিষ্টি কম্যুনিস্টির
নষ্টামিতে ভুলবো না॥
সজনী বিষম যাতনা।

'সাবাশ-সাবাশ' ধ্বনির মাঝে বাংলা গান থামতেই ময়দানের এই হিরো হিন্দীতে শুরু করল—

ও দ্যাখো দ্যাখো
ভারতকে নওজোয়ান
তুফান বনকে গায়েগা
চীনীওকো মিটায়েগা।
আজ বারি হ্যায় হিন্দুস্তানকী
কানা হোগী পকিস্তানকী
কদম বাড়াকে চল্
হিন্দু-মুসলমান॥
ও দ্যাখো দ্যাখো
ভারতকে নওজোয়ান।

গান শেষ হতে না হতেই পটাপট হাততালি। এবং সামনে পাতা গামছাতে দুই-পাঁচ-দশ নয়াপয়সার অঝোর বৃষ্টি।

জমিয়ে বসব ভাবছি, এমন সময় পেছন দিকে ঢাক-ঢোলের আওয়াজ। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে এক ছোট মিছিল এগিয়ে চলেছে। দলের সবার মাথায় গান্ধীটুপি। দুজন বাজাচ্ছে ঢাক-ঢোল, অন্য জনের ঘাড়ে ঝোলানো বেসুরো হারমোনিয়াম। মিছিলের সামনে ফেস্টুন। তাতে হিন্দীতে লেখা—'বীর ভারত।'

পুরোভাগে যিনি আছেন, তাঁর হাতে এক বাণ্ডিল বই। বইয়ের নাম "খুনী বিউগল।" হিন্দীতে লেখা। প্রথম পৃষ্ঠায় নেহেরুর ছবি, আর ভারতের একখানা মানচিত্র।

ওরা চারণ কবির দল! ওরা গেয়ে চলেছে দেশোদ্দীপক গান। গানের রচয়িতা রামখেলাওন সিং। বাড়ি জমুয়ার, গয়া।

মিছিলের কাছাকাছি আসতেই শুনি সামনের লোকটি গাইছেন—

রাম-কৃষ্ণ কে সন্তানোঁ কো তুমনে
কোঁ্যা ললকারা হ্যায়
দূর হটো চীনী বোনো
নেফা লদ্দাখ হমারা।

তৎক্ষণাৎ পেছনের লোকদের ধুয়া। নেফা লদ্দাখ হামারা হ্যায়।'

পরের গানটা ভোজপুরী ঝুমুর। তালের বাহার আর চটকদার।

জংগল কাটি কাটি
সড়ক বনায়ব
চলায়ব ট্রাকগাড়ি
মোরে বালমুআ॥

সড়ক বনায়ব আউর
নেফা পহুঁছায়ব,
ধৌলাসে আগাড়ী
(মোরে বালমুআ)
আপন জবান কে
রেশন ভেজায়ব
ঘি, দুধ, ফল, তরকারী ॥
(মেরে বালমুআ)

গান শুনতে শুনতে আমি তন্ময়। এদিকে গড় উইলিয়াম রাঙা করে সন্ধ্যা নামছে, ওদিকে চৌরঙ্গীর পথে জ্বলে উঠেছে নিয়ন আলো। ছুটে চলেছে ট্রাম-বাস-মোটরগাড়ির মাঝখানে সিনেমাপাগল, রেস্টুরেন্টবিলাসী। এই দু'দিকে অনেক ফারাক। চেহারায়, ছবিতে, মনে। ওদিকের আলো, ওদিকের ইসারা তখন ডাকে। সে ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু মনে হবে, পিছু হটে এইমাত্র অনেক আগেকার কোন শতাব্দী থেকে ফিরে এসেছি।



তিনচাক্কী আড্ডায়

সারবাঁধা সারথির দল দাঁড়িয়ে আছে। বাস থামতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সামনে।—'এই যে বাবু এদিকে', 'আসুন, আসুন বাবু, আসুন', 'চলে গেল, চলে গেল, চার চ্চার আনা, চ্চলে গেল',— একসঙ্গে হরেকরকমের আওয়াজ আর হর্ণের পক্ পক্ পক্। মোদ্দা

কথা—হেঁটে যাবেন না, সাইকেল রিক্সা আছে কী করতে, উঠে পড়ুন চটপট। আর দেখুন, কেমন ঝড়ের বেগে বাড়ির দোরগোড়ায় আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।

রথীর অপেক্ষায় এই ধরনের অসংখ্য সারথি দাঁড়িয়ে থাকে শহরতলির মোড়ে। কর্পোরেশনের চৌহদ্দি যেখানে শেষ, সেখানে,—সব জায়গায়। যাদবপুর, গড়িয়া, বেহালা, বরাহনগর, দমদমে। ওদের চেহারা প্রায় এক। মার্কা মারা। রোদে পোড়া তামাটে মুখ, পায়ে মোটরটায়ারের স্যাণ্ডেল, পরণে ছেঁড়া খাকি প্যান্ট, রঙীন গেঞ্জি, নোংরা বুশসার্ট। কারও মাথায় মান্ধাতা আমলের ফেল্টের ফালতু টুপি।

ঘুরতে ঘুরতে সাইকেল রিক্সাচালকদের এক আড্ডায় সেদিন হাজির। আলিপুরের টাঁকশাল ছেড়ে খানিক দক্ষিণে ডায়মণ্ড-হারবার রোড আর, এস.এন. রায় রোডের মোড়ে। হ্যাণ্ডেলে হেলান দিয়ে সে বললে,—'বাবু এই এবড়োখেবড়ো পথে মাকু মারতে মারতে জান কয়লা। রোজগারই-বা কত। এই ধরুন, দিনে চার কি পাঁচ টাকা। তাও অনেক সময় হয় না। মালিককে দিতে হয় পাঁচসিকে করে। ছোটখাট সারাইয়ের খরচ আছে, লাইসেন্সের খরচ আছে, খাওয়াপরা আছে, হেনতেন খুচরা খরচার শেষ নেই। মাসের শেষে দেখা যায়, হাতে এক আধলাও নেই।'

অর্থাৎ সে বলতে চায়, 'সাত দু'গুণে চৌদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।' এবং মাসের শেষে ঐ পেনসিলই সে চোষে।

ইতিমধ্যে আরও দু'জন চুটকি হিন্দী গানের সুর ভাঁজা শেষ করে এগিয়ে এসেছে। বেলা দুপুর। যাত্রীর ভিড় কম। বিড়িটায় শেষটান মেরে, ফেলে একজন বললে, 'সাতবচ্ছর চালাচ্ছি রিক্সা।

এমন পোড়া চেহারা ছিলনা বাবু। বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দু'-দিন বাদেই শুরু হবে খক্ খক্ কাশি। ব্যস্, রিক্সাচালানো খতম।'

পাশের জনের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, 'এই যে দেখছেন পরাণ—জোয়ান চেহারা। আর বেশীদিন নয়, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নির্ঘাৎ আমার দশা। নতুন এসেছে কিনা, তাই দাপট আছে। তাও যদি বাবু রোজ আট দশ টাকা রোজগার হত, খাটুনি পুষিয়ে যেত।'

পরাণ বললে—তোর তো তবু ভাল. বিয়ে করিসনি, বাড়তি খরচ নেই। আমি মরেছি। নইলে তোদের মত সীটের তলার খুপরিতে সংসার রেখে এই রিক্সাতেই কুঁকড়ি মেরে শুয়ে রাত কাটাতাম। এখন বৌয়ের জন্যেই ঘরভাড়া, শাড়ি-জামার খরচ, কত কী!

—'তুই তো মরেছিস, আমি বাবা ওসবে নেই। বৌয়ের ঘ্যানঘ্যানানি কে শুনবে। খাও দাও, ফুর্তি কর, সিনেমা দেখ, ব্যস।'—

—'তুইও যেমন, বৌকে বসিয়ে রেখেছি নাকি, লাগিয়েছি ঝিয়ের কাজে। কিন্তু এখন আবার মহা ফ্যাসাদ'—

ওদের দুজনের কথাবার্তা শুনে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আর একজন রিক্সাওয়ালা শয়তানির হাসি হাসে, ইঙ্গিতপূর্ণ চটুল সুরের গান ধরে। অন্য রিক্সাওয়ালাদের তৎক্ষণাৎ ফিকফিক হাসি। একজন আবার শিস দেয়।

এককথায় দশ কথা। আমি অপ্রস্তুত বোধ করি। আসল কথা তলিয়ে যায়। চটপট এক রিক্সায় উঠে পড়ি। তারপর আবার পথ-চলতি আলাপ। হাতে সময় পাঁচ মিনিট।

রিক্সাওয়ালা বলে, 'ভোর ছ'টা থেকে রাত এগারোটা বারোটা, গাধার খাটুনি খাটছি। 'পাসিঞ্জারই' হয় না। তার উপর এক

আনা দু'আনা নিয়ে খেঁচাখেঁচি। সিনেমার নাইট শো ভাঙে, পাসিঞ্জার হল তো হল, নয় শেষ 'টিরিপ' মেরে ঘুম। আবার সেই ভোর ছ'টা। এই চলেছে।'

লোকটাকে কথায় পেয়েছে। আমার নির্দেশমত ডাইনে বাঁয়ে বাঁক ফেরে আর বকবক চালিয়ে যায়।

—'শীতের সময়টা হারামী। কেউ রিক্সা চড়তে চায়না। বাবুদের পায়ে জোর বেড়ে যায়। গরমের সময়, এই ধরুন মার্চ-এপ্রিল মাসেই যা কিছু রোজগার। পায়ে পিচের গরম, মাথায় আকাশের গরম। বাবুরা ঝপাঝপ রিক্সায় উঠে পড়েন, আমাদের দু'পয়সা হয়? অন্য সময়? কেবল ডাকাডাকি, 'আসুন বাবু, আসুন।' দশটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে তো তিনজন পাসিঞ্জার। সাত রিক্সা ভেরেণ্ডা ভাজে। খানিকবাদে নামলেন বাস থেকে চারজন। বাবু, বাবুর বৌ, দুটি বাচ্চা। কোথায় ভাড়া করবেন দুটি রিক্সা, উঠলেন একটিতে। আপত্তি শোনেন না। পয়সাও সেই চারআনা। এদিকে টানতে গিয়ে ঘাম ছোটে বুকে খিল ধরে। ঝাড়ু মারি এই রিক্সাটানার কপালে। তার চেয়ে কোন কারখানায় কাজ পেলে চলে যাই।'

'এই এই রোখ কে, ইধার ঠা-রো।'—গন্তব্যস্থলে এসে গেছি। রিক্সাওয়ালা গাড়ি থামায়।

ভাড়া নিতে নিতে একগাল হেসে বলে, 'এতক্ষণ বাংলায় কথা বললাম. আপনি হিন্দীতে বলছেন কেন বাবু? সবাই ঐ রকম বলে। রিক্সা টানি বলেই আমরা হিন্দুস্থানী হয়ে গেছি নাকি? আমার বাড়ি বসিরহাট।'



আর্মানি

আগেকার সেই দাপট নেই, জমজমাটি বোলবোলাও নেই, তবু আরও দশজন বিদেশীর মত এই শহরকে নিজের বানিয়ে এখনও টি'কে আছে আর্মানিরা। কলকাতার পরিচয় পেতে হলে এদের বাদ দিলে চলবে না।

কলকাতার মত এমন বিশ্বজনীন চেহারা বোধহয় আর কোন শহরের নেই। পথে বেরোলেই হাজার জাতের লোকের সাক্ষাৎ মেলে। দু-পা যেতে না যেতেই একজন চীনে, নয়তো একজন পার্শী। গ্রীক, হাবসী, ইরাকী, ইরাণীও অদৃশ্য নয়। যেমন নয়, 'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ।' তাঁদের মধ্যে আর্মানিদের একটা বিশেষ স্থান আছে এই শহরের ইতিহাসে।

কলকাতার আদি পর্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংরেজ তনয় জব চার্ণকের নাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, তারও আগে কলকাতাতে উপনিবেশ গড়েছিলেন আর্মানী বণিকের দল। গোড়ায় সংখ্যা ছিল পনেরো কুড়ি হাজার। এখন কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে হাজার দেড় হাজারে। নগর জীবনের সঙ্গে এঁরা আজ একাত্ম। চৌরঙ্গী, পার্ক সার্কাস, বৌবাজার পাড়ায় এখনও দেখা মেলে আর্মানি পরিবারের। এখনও দেখা যায়, তাঁদের অতীত গৌরবের অজস্র স্মৃতি। চৌরঙ্গী রোডে দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় গ্র্যাণ্ড হোটেল,

ডালহৌসী পাড়ায় স্টীফেন হাউস, পার্ক স্ট্রিটে গলস্টন পার্ক। আজ তাদের মালিকানা বদল হয়েছে, ব্যবহারিক রূপান্তর হয়েছে। কিন্তু একদিন এই বাড়িগুলিই ছিল আর্মানি বণিকদের বাণিজ্যের ঘাঁটি। লাখ লাখ টাকা খরচ করে এইরকম অনেকগুলি দর্শনীয় বাড়ি বানিয়েছিলেন আর্মানী বণিকেরাই।

ক্ষুদ্র দেশ আর্মানিয়া। বর্তমানে সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রে। শোনা যায়, ভারতের মাটিতে প্রথম যে আর্মানী পা দিয়েছিলেন তার নাম টমাস কানা। তিনি মালবারে আসেন ৭৮০ সালে। আরও পাঁচজন বিদেশীর মত ভারতের বাণিজ্য সম্পদই আকৃষ্ট করেছিল আর্মানিদের। মোগল-সম্রাট আকবরের সময়ই ওরা হুড়াহুড়ি করে অবাধে ঢুকতে লাগল ভারতে। আকবর বাদশাহর নাকি মরিয়ম বেগম নামে একটি আর্মানী বউ ছিল। নবাব মীরকাশিমের প্রতাপশালী সেনাপতি গর্গিন খাঁও ছিলেন আর্মানী।

ধীরে ধীরে গোটা ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে গেল আর্মানিদের হাতে। তাঁদের হাঁকডাকে, ঐশ্বর্যের জৌলুসে সারা ভারত জমজমাট। ধীরে ধীরে তাদের নজর পড়ল পূব দিকে এবং উপনিবেশ গড়ে উঠল চন্দননগর, চুঁচুড়া, ঢাকা, কলকাতায়।

জব চার্ণক আসার আগেই কলকাতাতে প্রায় ৬০।৭০ জন আর্মানি বণিকের উপনিবেশ ছিল। পূর্বাঞ্চলের ব্যবসাতে তখন থেকেই তাঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য। শুধু তাদের বাণিজ্যতরীর জন্যে গঙ্গার কূলে ছিল আলাদা ঘাট। এখনও সেই বিগত দিনের স্মৃতি বহন করে কলকাতায় দাঁড়িয়ে আছে 'আর্মেনীয়ান ঘাট'।

বাংলাদেশে পাকাপাকি আর্মানী বসতি হল ১৯৬৫ সালে। মুর্শিদাবাদের কাছে সৈদাবাদে। এইখানেই বাস করতেন বিখ্যাত আর্মানী খোজা পেৎরুস আরাথুন। অন্ধকূপ হত্যা

কাহিনীর পর কলতায় পলাতক ইংরেজ পরিবারের ছ-মাসের আহার জুগিয়েছিলেন তিনিই। আরাথুন ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

আর্মানিরা ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িয়েছে, কলকাতায় স্থায়ীভাবে আস্তানা পেতেছে, গড়েছে নিজেদের গির্জা, স্কুল, ক্লাব, আতুরাশ্রম। গত ১৯৫৭ সালে কলকাতার আর্মানী গির্জার আড়াইশত বৎসর পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে হয়ে গেছে।

কলকাতায় আর্মানিদের প্রথম স্কুল বসান আরাথুন কালুস। ১৭৯৮ সালে। এখন তার নাম আর্মানীয়ান কলেজ অ্যাণ্ড ফিলানথ্রপিক একাডেমি। ছাপ্পান্ন নম্বর ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে এই বাড়ি। এই বাড়িটা ঐতিহাসিক। এখানেই কোন এক ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে। আর্মানি স্কুলের বর্তমান অধ্যক্ষ হচ্ছেন মিস্টার বাহার পোলাডিয়ান। পণ্ডিত ব্যক্তি। বেরুতের আর্মানি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। এই স্কুলেই পড়ে আর্মানি ছাড়া ইরাক, ইরাণের প্রবাসী ছাত্রছাত্রী। ভবানীপুরের ডেভিডিয়ান গার্লস স্কুলও এর সঙ্গে যুক্ত।

আরাথুন পরিবার ছাড়াও কলকাতার আর্মানিদের মধ্যে ছিলেন অনেক নামজাদা লোক। যেমন মিস্টার জে. সি গলস্টন, স্যার গ্রেগরি চার্লস পল্। স্যার গ্রেগরি বাংলাদেশের এডভোকেট জেনারেল ছিলেন অনেকদিন। ক্রীড়াজগতে সুপরিচিত পিয়ার্সন সুরিটা এবং কমিশনার আইভান সুরিটাও শুনেছি আর্মানি। তাছাড়া আরও বহু পরিবার রয়েছেন এই শহরের কয়েকটি পাড়ায়। সবার মাঝে থেকেও তারা যেন একটু আলাদা। কিন্তু কলকাতাই তাদের সব।



সুরবালা মণ্ডল

পোড়ার মুখো 'লবীনকে' একটিবার হাতের কাছে পেলে দেখে নিত সুরবালা। তার থোঁতা-মুখ ভোঁতা করে দিত।

খুলনার সেই নিভৃত পল্লী থেকে কোলাহলের কলকাতায় কে নিয়ে এল তাকে? নবীন। মা-বাপ, ভাই-বোনের সুখের সংসার থেকে কে তাকে ঠেলে দিল ফুটপাতের আবর্জনায়? নবীন। কে তার জীবনটাকে এমন ছারখার করে দিল। নবীন—শয়তান নবীন। নবীনই তো সুরবালার জীবনে শনি। নবীনের উপর তাই তো তার এত আক্রোশ।

কাহিনী নবীনের নয়। সুরবালা মণ্ডলের। সুবোধ মল্লিক উদ্যানের পুব ফুটপাথে ছেঁড়াকাঁথার পুঁটলি বুকে নিয়ে যে বুড়ী রাত কাটায়, পথ-চলতি লোকের কাছে হাত পেতে যে বুড়ী খনখনে গলায় বলে,—"দুটি পয়সা দাও না বাবা, কিছু খেতে পাইনি বাবা—" সেই সুরবালার।

যদি বলি, ঐ লোলচর্মা বৃদ্ধার কোটর-চোখে একদিন ছিল মোহিনী মায়ার ইশারা, যদি বলি ঐ শনের নড়ি চুলের জঙ্গলে একদিন ছিল কেশবতী রাজকন্যার ছায়া, তাহলে? তাহলে আপনি অবাক হবেন, অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন। আমিও হেসেছিলাম। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। ডাস্টবিনের পাশে প্রেতিনীর মত বসে থাকা এই ভিখিরী বুড়ী এক নতুন রূপে ধরা দিল আমার কাছে।

নবীন তার গাঁয়ের ছেলে। গাঁয়ের নাম? পরিষ্কার মনে আছে—বাসুদেবপুর। 'খুলনে জিলাগো, খুলনে জিলা।' রেলগাড়িতে যেতে হয়, তারপর নৌকায়। সব কি আর ছাই মনে আছে, সে কতকালের কথা। চার পাঁচ কুড়ি বছর, হবে। কলকাতা শহরটাই কত বদলে গেল, তার সব কিছুই মনে নেই। আর বাসুদেবপুর, মা-বাবার কথা, ছোট ভাইটার কথা ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে।

নবীন কাজ করত কলকাতায়। কারখানায়। জোয়ান ছেলে। পূজোব ছুটিতে বাসুদেবপুরে এসেছিল সেবার। সুরবালার বয়স তখন তের কি চোদ্দ। নবীনের হাত ধরে চলে এল কলকাতায়। উঠল মানিকতলার এক বস্তীতে। হাসিখুশীর দিন কোথা দিয়ে পালিয়ে যায়, দুজনের কেউ টের পায় না।

কোথায় অজ পাড়াগাঁ বাসুদেবপুর, আর কোথায় রঙবেরঙের শহর কলকাতা। আহা, দেখে চোখ জুড়োয়। বাপমায়ের কথা? তা মনে পড়ত বৈ কি! মনে পড়ত বাড়ির পিছনে তেঁতুলতলাটার কথা, নারকোলী-আম-গাছটার কথা। কিন্তু তাতে কি, কলকাতায় নবীন রয়েছে যে।

সেই নবীনই সর্বনাশটি করে বসল। একদিন কারখানা থেকে আর ফিরল না। একদিন যায়, দুদিন যায়, পাত্তা নেই। কেঁদে ঘর ভাসাল সুরবালা। নবীন আর এলনা। কোনদিনই এলনা। চারদিকে অন্ধকার।

ছ মাস পরে মা হল সুরবালা। হাসপাতালে ভোগান্তির একশেষ। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে খাবে কী? একটি নয়, তখন আবার দুটি পেট। বস্তীর পাশের খুপরিতে থাকত মোক্ষদা। বড় ভাল মেয়ে। বেলেঘাটার এক বাবুর বাড়িতে কাজ জুটিয়ে দিল। ঝিয়ের কাজ। বেঁচে গেল সুরবালা।

কিন্তু যে মরতেই জন্মেছে, সে কি আর সহজে বাঁচতে পারে? ঝি-গিরিরি সুখ বেশীদিন টিঁকল না। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার কপাল পুরল। "না বাবু, ঐটে ক্ষেমা কর, বলতে পারবুনি। খেয়েছি দেয়েছি, আরামে থেকেছি দিন কেটে গেছে, কিন্তু মনে সুখ ছিল না। হারামজাদা পেটের ছেলেটাও' ফ্যা ফ্যা করে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

কাটল কয়েক বছর। তারপর যা হয়। আবার পথ। সব খুইয়ে বাকী রয়েছে শুধু ভিক্ষে করার রাস্তা। তাই সই। শ্যামবাজারের এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল মায়ে-পোয়ে। প্রথম প্রথম লজ্জা করত, তারপর একদিন চক্ষুলজ্জাও উবে গেল। মুখে করুণ করুণ ভাব ফুটিয়ে বেশ চমৎকার গড়গড় করে বলতে পারে, 'বাবা গো, একটি পয়সা দাওনা গো, খিদের জ্বালায় মরে গেলাম বাবা গো,—ওমা, মা লক্ষ্মী গো, একটি পয়সা দাওনা গো"— রোজগারও মন্দ হয় না। দুজনের পেট চলে যায়। ফুটপাথে বা কোন পোড়োবাড়ির তলায় সংসার।

কিছুদিন পর আবার একা। ততদিনে ছেলেটি 'পাকা বদমাস' হয়ে উঠেছে! 'ধুৎতেরি' বলে একদিন সে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল। নবীনেরই ছেলে তো। বাপের স্বভাব কোথায় যাবে। সুরবালা কাঁদল না। পোড় খেতে খেতে মন পাথর হয়ে গেছে।

তারপর কত বছর, কত পথ, কত অভিজ্ঞতা—সব হিসেব রাখেনি সুরবালা। আগে ভিক্ষের রোজগার মন্দ ছিল না। দিনে টাকা দেড় টাকা হয়ে যেত। এখন আর সে রোজগার নেই। বাবুরা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। চার আনা ছ' আনাও হয় না। পরিশ্রম করার বয়সও নেই। মনতো আগেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, শরীরও আর চলে না। চোখে দেখতে পায় না, মাথা কাঁপে

একটু হাঁটলেই পা অসাড় হয়ে যায়। কিছুদিন ভিক্ষে করেছে শেয়ালদা স্টেশনের কাছে। ঘুরতে ঘুরতে এইবার এইখানে। সুরবালা নিজেই বলে, বোধহয় এই তার শেষ আস্তানা। এইখানে সে রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, ডাস্টবিনের খাবার কুড়োয় কিংবা তিন ইঁটের উনুনে মাটির হাঁড়িতে সেদ্ধভাত চড়ায়। কখনও আশ্রয় নেয় পার্কের কোণের গুমটিতে। এই চলছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর।

এই সেদিনের কথা। ওয়েলিংটন-ধর্মতলার মোড়ে একদিন দাঁড়িয়ে আছে সুরবালা। একটা লোক হেঁটে চলেছে।—নবীন না? নবীনের মত দেখতে যে! পাকা চুলের আড়ালে আসল চেহারা যাবে কোথায়?

এগিয়ে গেল সুরবালা। লোকটা মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। না, তাহলে বোধহয় নবীন নয়, দেখার ভুল। ঝাপসা চোখে ভালো দেখতে পায় না সুরবালা।

কিন্তু নবীন হলেও তো তাকে চিনবে না। এই নোংরা ভিখিরী বুড়ি তো আর বাসুদেবপুর গাঁয়ের সেই কিশোরী সুরবালা নয়,—যার চোখে একদিন ছিল মোহিনী মায়া, যে ছিল কেশবতী রাজকন্যা। এযে অন্য মানুষ। ফোঁকলা দাঁতে বিড়বিড় করে সুরবালা। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে নিজের মনেই আবার বলে, 'ঐ পোড়ারমুখো নবীনটা বেঁচে আছে-কিনা কে জানে। একবারটা যদি ওকে দেখতেও পেতাম!'



ট্যাক্সি ডাকা ছেলে

আপনিও দেখেছেন মতিলালকে। গ্র্যাণ্ড হোটেলেয় সামনে ট্যাক্সি-ডাকা ছেলের দলে যেটি সবচেয়ে তুখোড়, যার গায়ে রঙীন শার্ট, নোংরা খাকি প্যাণ্ট, গলায় রুমাল—সেটিই মতিলাল।

চিনতে অসুবিধে হলে আর-একটু বলি। মতিলালের বয়স পনের-ষোল। মুখে ছিরি-ছাঁদ নেই। কপালের বাঁদিকে চওড়া কাটা দাগ। গ্র্যাণ্ড হোটেলে ভি. আই. পি'দের যাওয়া-আসার ভিড়ে. সেও একজন ভি. আই. পি.—ভেরি ইনসিগনিফিকেণ্ট পার্স'ন'।

তাই বলে সে হেলাফেলার ছেলে নয়। সন্ধেবেলা কাঁঠাল-ঠাসা বস্তার মত ট্রাম-বাসের ।ভড়ে বাড়ি ফেরার ব্যর্থ চেষ্টা করে আপনি যখন ধন নয়, মান নয়, সামান্য একখানা ট্যক্সির আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এবং ফিরে ফিরে ডেকেও, পরাণখুলে ডেকেও ট্যাক্সি ড্রাইভারের মন গলাতে পারছেন না, ঠিক সেই সময় 'বিপদে মধুসূদন' হয়ে আপনার সামনে হাজির হবে মতিলাল। বিড়ি-খেকো কর্কশ গলায় বলবে—'ট্যাক্সি চাই বাবু।' আপনি ছালে পানি পাবেন। মতিলাল তক্‌খুনি দৌড়োবে, রুমাল নাড়বে। আর দেখবেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই 'বন থেকে বেরোল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।'—অর্থাৎ আলোয় লেখা 'ট্যাক্সি' শব্দটির ছাপমারা একখানা জলজ্যান্ত আস্ত মোটরগাড়ি আপনার সামনে এসে হাজির। সীটে বসিয়ে, দরজা বন্ধ করে স্মিতহাস্যে

মতিলাল আপনার কাছে হাত পাতবে। আপনিও তখন পরম তৃপ্তিতে তাঁর হাতে তুলে দেবেন দশ নয়া পয়সা। মতিলাল আবার ছুটবে খদ্দেরের পেছনে। ট্যাক্সির পেছনে। এই তার কাজ।

মতিলালের পদবী ? তা সে নিজেই জানে না। পদবী নিয়ে সে মাথাও ঘামায় না।—"দোস্তরা বলে মতিলাল—মতি. ব্যস।"—তার জন্ম কোথায়. দেশ কোথায়, তা-ও তার জানা নেই। শুধু মায়ের কথা আবছা আবছা মনে পড়ে। গোড়ায় মায়ের হাত ধরে ভিক্ষে করতো। বাবা ?—'ধু-স, বাবা-ফাবা জানি না।'—তবে ?

—'তবে আর কি ছোটবেলায় ভিক্ষে করতাম টালিগঞ্জ ট্রাম-ডিপোর কাছে। লোকগুলো হাড়কৃপণ, রোজগারে পেট ভরত না। স্বপ্ন দেখতাম, কবে চৌরঙ্গীতে ভিক্ষে করতে যাব। সেখানে অনেক আলো, অনেক মজা, হ্যাট-কোট, শাড়ি-গাড়ির ভিড়। জোর রোজগার।'

'হাঁটতে হাঁটতে ঘুরে গেলাম চৌরঙ্গীপাড়া। ভাল লেগে গেল। ব্যস, ট্রামডিপো ছেড়ে একদিন দাঁড়িয়ে পড়লাম এসপ্ল্যানেডের ট্রাম গুমটির কাছে। রোজ একঘেঁয়ে একটানা কাজ। —'খেতে পাইনি বাবু' 'দুটি খেতে দাও বাবা।' —সকাল সন্ধ্যে বকর বকর চলছে তো চলছেই। কেউ পয়সা ছুঁড়ে দেয়, কেউ চলে যায়। মেয়েলোক হলে দু'চার পয়সা জোটে।'

'মন্দ চলছিল না। পাঞ্জাবী দোকানে রুটি খেয়ে, হিন্দী সিনেমা দেখে রোজগার কাবার করে দিতাম। তারপর আর ভাল লাগল না; হঠাৎ এল এক গ্যাঁড়াকল। নয়াপয়সা। রোজগার ঝড়াকসে কমে গেল। বেশীরভাগ লোকই দিত এক পয়সা, এখন দেয় এক নয়া পয়সা। বিলকুল লোকসান। রোজগার 'হাফ' হয়ে গেল। পেটই ভরে না তো সিনেমা। 'ধুৎতেরি' বলে ছেড়ে দিলাম এ কাজ। লেগে গেলাম ট্যাক্সিডাকার কাজে। মাঝে মাঝে

ভিক্ষেও করি। ট্যাক্সিডাকা ভাল কাজ। নগদা নগদ বখশিস। রোজ দেড়টাকা দুটাকা হয়ে যায়।'

'থুক' করে পানের পিকটা ফেলে বিড়িতে সুখটান মেরে মতিলাল আবার বলল—"আরামে আছি। খাই-দাই, আড্ডা মারি, ময়দানে তাস খেলি, রাত্রে ফুটপাতে শুয়ে পড়ি। কাউকে পরোয়া করিনা। ডোণ্ট কেয়ার।"

জিগগেস করেছিলাম, সে অন্য কাজে যাবে কি না। বসা চাকরী বা কারখানায়। অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে—'দু—উ—র।'



বাক্যবাগীশ

সেই লোকটি কোথায় গেল? বাস স্টপের কোলঘেঁষা ফুটপাতে দাড়িয়ে যে এক আনার নোটবই ফিরি করতো?

আপার সার্কুলার রোড হ্যারিসন রোডের মোড় ঘুরতেই শোনা যেত কলকল নিনাদ। বাস থামছে, যাচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথার তুফান ছোটাচ্ছে সেই লোকটা। মুখতো নয়, যেন তপ্ত কড়াই। অনবরত খই ফুটছে।

—"এই যে চাল গেল, এক এক আনা দামের এক একখানা নোট বই। ফ্যালনা জিনিস নয়। বেলাবেলি বাড়ি নিয়ে যান, নইলে পস্তাবেন। ধোপা কাপড় নিতে এসেছে, হিসেব কোথায় রাখবেন? দেয়ালে লিখলে বাড়িওয়ালা ধমকাবে, ছেলের অঙ্কের খাতায় টুকলে ছেলে ধমকাবে, গিন্নীর দামী রাইটিং প্যাডে লিখলে

গিন্নী ধমকাবে, চারদিকে ধমক। ধমকের হাত থেকে বাঁচতে চানতো, নিয়ে যান এই এক আনা দামের সোনার টুকরো নোটবই। এই যে দাদু, চলে গেল নোট বই, এক এক আনা—"

বাস ছাড়ার মুখে খানচারেক বিক্রী হয়ে গেল। যারা কিনল না তারাও অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল বাক্যবাগীশ লোকটার দিকে। আবার আর একখানা বাস। আবার কথামালা।—"ঠিকানা বলুন, ফোনের নম্বর বলুন, সবই টুকে রাখা চাই। আর টুকতে গেলে নোট বই চাই। এই যে দাদুরা, এক এক আনা দামের নোট বই, সস্তায় বাজীমাৎ। বাসে চলেছেন, পাশে বসলেন শ্বশুরমশাই, তিনি দিলেন এক জরুরী ঠিকানা। দু'জনের কাছে কাগজ নেই। মহা মুশকিল। কোথায় ঠিকানা টুকবেন? মনে মনে জপেও সব গোলমাল হয়ে গেল। বাড়ি যেতেই গিন্নী আগুন। ঠিকানা কই। ব্যস হয়ে গেল। কথা বন্ধ, মেজাজ খারাপ, অম্বলের অসুখ, তিন দিনের অফিস কামাই। মাইনে নিতে গিয়ে দেখেন টংকা কাটিতং। ঝামেলা বাঁচাতে হলে পকেটে রাখুন ছোট একখানা নোটবই। ঠিকানা ধোপার হিসেব, কবিতার লাইন, সব টুকে রাখুন। এই যে স্যার, চলে গেল, একআনা দামের নোটবই। ও বড়দা নেবেন নাকি একখানা—

বাসের জানালা দিয়ে কয়েকখানা হাত বেরোল, চটপট হাত বদল করল, কয়েকখানা নোটবই আর খুচরো পয়সা। তারপর আবার কথার দৌড়।

ফিরিওয়ালাদের বাগবৈদগ্ধ্যই একমাত্র অস্ত্র। সেই অস্ত্রের আঘাতে ছাপোষা লোকেরা অল্পেই ধরাশায়ী হন। কলকাতার রাস্তায়, লোক্যাল ট্রেনের কামরায় ফিরিওয়ালাদের কথনশৈলী উপভোগের জিনিস। ইনিয়ে-বিনিয়ে হাজার কথার জাল বুনে, এবং সেই জালে রুই-কাৎলা, খলসে-পুঁটি বেঁধে ফেলবার কায়দা-কানুন

ওরা চমৎকার জানে। নোটবইয়ের ফিরিওয়ালাটিও ঐ জাতের। হয়ত আর এক কাঠি বাড়া। তার সরস কথাবার্তা ঐপথে যানেওয়ালা প্রায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গত দশ বারো বছর থেকে তাকে ঐ এক জায়গাতে দেখে আসছি। হাতগোটানো নোংরা ফুলশার্ট, ততোধিক নোংরা পাজামা, পায়ে টায়ারের চটি। চুল উসকোখুসকো, চোখ কোটরে এবং ক্লান্তিভরা মুখে কথায় তুবড়িবাজী।

একদিন বাস থেকে নেমে আলাপের চেষ্টাও করেছি। কিন্তু জমেনি। আমাকে পাত্তাই দিল না। বললে—"দূর মশাই, এমনিতে বক বক করে মুখে ফেনা উঠছে, আর এখন আবার আপনার সঙ্গে ফালতু ভ্যাজর ভ্যাজর করি। খেয়েদেয়ে কাজ নেই। নাম? নাম দিয়ে কি হবে মশাই? যদি বলি আমার নাম পঞ্চানন, তা আমার বিক্রী বেড়ে যাবে? যদি বলি আমার নাম রাসবিহারী, তাহলে আমার শিং গজাবে, না আপনার? একলা মানুষ, কথা বেচে খাই, বাড়ি কোথায়, নাম কী, কত রোজগার হেন-তেন প্রশ্নের জবাব দিয়ে মরি আর কি! ধুৎতেরি মশাই, এদিকে একখানা বাস মিস করে ফেললাম আপনার সঙ্গে ফালতু বকর বকর করে। আচ্ছা নমস্কার—"

নিতান্ত অবজ্ঞাভরে লোকটি এইমাত্র থামা বাসের দিকে চলে গেল। তারপর ঐ একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি, নোটবইয়ের মহিমাকীর্তন। বাস থামছে, লোক নামছে উঠছে, কণ্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে, চারিদিকে হট্টগোল। তারমধ্যে কর্কশকণ্ঠের ঘুরপাক খাওয়া একটিমাত্র কথা—নোট বই, এক আনা চলে গেল, এক আনা।"

সে বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। এই কিছুদিন আগেও লোকটাকে দেখছি ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নোট বইকে কেন্দ্র

করে, নিত্যনতুন কথামালা তৈরী করতে। তারপর হঠাৎ দেখা নেই। একদিন দুদিন, বেশ কয়েকদিন থেকেই নেই। বাসে চড়ে ঐ ষ্টপে থামতে দেখি অন্য ফিরিওয়ালা। তার হাতে ধূপকাঠি, নোট বই নয়, গলা বাড়িয়ে চোখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক অনেক খুঁজলাম; কিন্তু সে নেই। কোথায় গেল সেই কথার যাদুকর?

সুজন সিং

ইয়া গোঁফ, চাপদাড়ি আর বিরাট পাগড়ির ফাঁক দিয়ে এমন চমৎকার বাংলা বেরিয়ে আসবে, ভাবতেই পারিনি।

সম্মুখে নিবদ্ধ দৃষ্টি সর্দার সুজন সিং বাঁ হাতে স্টিয়ারিং নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন—"কেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? ছোটবেলা থেকে বাংলা দেশে আছি, আর বাংলা কথা বলতে পারব না?"

একগাল হেসে আবার বললেন, "মজার ব্যাপার কি জানেন, অনেক বাঙালী আছেন, যাঁরা আমি বাংলা বলা সত্ত্বেও হিন্দীতে আমার সঙ্গে কথা বলবেনই; তাও যদি হিন্দীটা শুদ্ধ হত।"

সর্দারজীর বাড়ি সুদূর পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে। কিন্তু সে স্মৃতি আবছা। মা মারা যাবার পর বাবার হাত ধরে ছোটবেলায় এসেছিলেন কলকাতায়। তারপর আর যাননি। বাবাও ছিলেন কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভার। বাবার মৃত্যুর পর দেশের টান একেবারে আলগা হয়ে গেছে। এখন কলকাতাই দেশ। ভবানীপুরে জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডে আড্ডা।

সুজন সিং বললেন, "বাবার ইচ্ছে ছিল, অন্য কাজ করি। সেইজন্যে আমাকে পড়িয়েছেন কলেজে। এই আশুতোষ কলেজ

থেকে আই-এ পাশ করেছি। কিন্তু আমাদের কপালের লিখন কে খণ্ডাবে। আই-এ পাশ করেও সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারী। উনিশ বছর এই চলছে।"

শিখ ড্রাইভারদের খ্যাতি ভারত জোড়া। আগে কলকাতার রাস্তায় শিখ ড্রাইভারদের ট্যাক্সি ছিল একচেটিয়া. এখন দেশ-বিভাগের পর বাঙালীরাও এসেছেন। কলকাতার ট্যাক্সির সংখ্যা দু'হাজারের ওপরে। তার মধ্যে ৭।৮ শত শিখ ড্রাইভার। কলকাতার জীবনের সঙ্গে এঁদের ছবি অবিচ্ছেদ্য হয়ে আছে।

সর্দারজী ডানদিকে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে বললেন—"আপনারা তো ভাবেন, আমরা গাদা গাদা টাকা রোজগার করি, দু'হাতে ওড়াই, ব্যাঙ্কে জমাই। বাজে কথা, সব বাজে কথা। এক পয়সাও হাতে থাকেনা।

"এই ধরুন না, ট্যাক্সি আমার নিজের নয়, অন্যের হয়ে চালাই। দিনে ষাট-সত্তর টাকা ওঠে। আমার বরাতে পনেরো পার্সেণ্ট কমিশন আর জলখাবার দু'টাকা। রোজ চালালেও মাসে আর কত হয়? সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি উশুল করতে যে 'রসদের' দরকার তাতেই সব ফতুর হয়ে যায়। নইলে আমি একলা মানুষ, এত দিনে অনেক টাকা জমে যেত।

"ট্যাক্সির মালিক কেন হচ্ছি না? আরে বাবা, সে আরও ঝামেলা। কিস্তিবন্দী গাড়ি কিনে কিস্তির টাকা শোধ করতে করতেই গাড়ির দফারফা। পেট্রোল মবিলের দাম বাড়ছে, সরকারী ট্যাক্স বাড়ছে, কর্পোরেশনের ট্যাক্স বাড়ছে, ঐ ট্যাক্স দিতে দিতেই জান সাবাড়। তাছাড়া একবার অ্যাকসিডেণ্ট হলেই বারোটা বেজে গেল। রোজ একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। তার চেয়ে এই ঢের ভাল।"

সর্দারজীর একনাগাড় কথা থামতেই আমি বললাম, "আপনারা

কিন্তু ট্যাক্সি খালি থাকলেও অনেক সময় যাত্রী নেন না, আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। দূর-পাল্লার যাত্রী না হলেও নিতে চান না।”

‘ঠিকই বলেছেন বাবুজী—”

সর্দারজী বলেন, “কিন্তু অফিসটাইমের সময় ছাড়াতো আমরা পথে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াই। আমাদের ভেতর খারাপ লোক যে নেই, এমন কথা বলিনে, তবে সবাই নয়। দেখবেন, আপনার সঙ্গে মেয়েরা যদি কেউ থাকেন, তাহলে আমরা কাছ ঘেঁসে দাঁড়াই। জানি, হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন। সখের প্রাণ, গড়ের মাঠ ধরে ঘুরবেনই আর মিটারেও চড়চড় করে টাকা উঠবে। দূরে যেতেও চাই কেন? নইলে মজুরী পোষায় না যে। আবার দূরে যেতে অনেক সময় নারাজ হই। তার কারণ আছে। যাত্রী ত সবাই সমান নয়, কার কী মতলব জানিনে। এই তো দেখুন না, বছর দুই আগেকার কথা। রাত তখন সাড়ে দশটা হবে। দুটো লোক ট্যাক্সিতে উঠল মেট্রোর কাছে। বললে—‘বেহালা যাবে?’ দোনামনা করে রাজী হয়ে গেলাম। লোক দুটোর চেহারাই যেন কেমন কেমন লাগছিল। মাঝেরহাট ব্রিজ পেরিয়েছি। আলিপুরের টাঁকশালও পেরোলাম। একজন বলল—‘ডাইনা ঘোরাও।’ অর্থাৎ বেহালা নয়, তারাতলা রোড বরাবর চল। আমি আপত্তি করলুম। কিন্তু ওঁদের দাঁতমুখ খিঁচুনো জবরদস্তির চাপে পড়ে রওনা হলুম। ব্যস, আমার সর্বনাশটি হয়ে গেল। ধাক্কা মেরে ষ্টিয়ারিং কেড়ে নিয়ে, ছোরা উঁচিয়ে সেদিনকার রোজগারের সব টাকা, হাতঘড়ি, আংটি সব ছিনিয়ে নিল। তারপর আমার মুখ বেঁধে রেখে পালাল। রাত অনেক, পথ জনবিরল, আমি একা। ওরা ছিল দু'জন, তাই কিছু করতে পারলাম না। এই ধরনের অভিজ্ঞতা প্রায় সব ট্যাক্সি ড্রাইভারের আছে। তাই তো আমারা সাবধান হয়ে যাই। রাত হলে আজকাল সঙ্গে লোক বসিয়ে রাখি।

"তবে হ্যাঁ, মজার মজার অনেক ঘটনাও ঘটে। প্রায়ই। কত ধরনের লোক পেছনের সীটে বসে কত ধরনের আলাপ করে যায়। আমরা গম্ভীর মুখ করে ষ্টিয়ারিং ধরে রাখি, না শোনার ভান করি। কিন্তু ঠিক শুনি। বেহেড মাতালও ওঠে অনেক সময়। তাদের নিয়ে অনেক ঝামেলা। আবার কত প্রেমালাপই না শোনা যায়। ইনিয়ে বিনিয়ে কত কথা। কাঁচা বয়সের ছেলেমেয়ে একসঙ্গে উঠলেই আমরা কান খাড়া করে রাখি। আর কি করি জানেন? সামনের ছোট আয়নাটা ভাল করে ফিট করে নিই—যাতে পিছনের সীটের সব দেখা যায়; কি দেখি, তা বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে, গল্প ফুরোবেই না"—

সর্দারজীর চোখে দুষ্টুমির হাসি খেলে যায়।

আফগান ব্যাঙ্ক

কেউ বলে আফ্‌গান-ব্যাঙ্ক, কেউ বলে কাবুলিওয়ালা। সংক্ষেপে 'কাব্‌লি।' কাবুল, কান্দাহার, হিরাট, গজনী, আফগানিস্থানের যেখানে খুশী বাড়ি হতে পারে, এমন কি ওয়াজিরিস্থানের হলেও আপত্তি নেই—তবু সে কাব্‌লি। গোঁফ, লাঠি, শিলওয়ালা কোর্তায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তিন অক্ষরের এই শব্দটি অনেকের কাছেই আতঙ্কজনক। নাম শুনলে কেউ সদর দরজা বন্ধ করে, কেউ খিড়কি দরজা দিয়ে সটান পালায়।

গ্রামে যান, গঞ্জে যান, মফঃস্বল শহরে যান, সর্বত্রই কাবুলিরা সশরীরে অধিষ্ঠান। আর কলকাতা? আপিসে আদালতে, অলিতে গলিতে, বস্তিতে বাড়ীতে কোথায় সে নেই? দু'পা যেতে না যেতেই কাবুলিওয়ালাদের তেলে পাকানো লাঠির ঠকঠক এবং

হাজার দেড়েক পেরেক। ঠোকা জুতোর মশ্‌মশ্‌। ওয়া সর্বভূতে বিরাজমান।

বাৎসল্য রসে ভরপুর রহমৎ শেখ ব্যতিক্রম, কবির সৃষ্টি;—অধিকাংশ কাবুলিই মূর্তিমান বিভীষিকার রূপ নিয়ে অধমর্ণের সামনে দাঁড়ায়। এই শহরে তাদের সংখ্যা কম নয়। কমপক্ষে আড়াই হাজার। তারা ছড়িয়ে আছে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে,—শহরের সর্বত্র। দশজন, পনেরোজন, একটা গোটা বাড়ি ভাড়া নেন। কিংবা নেয় বড় কোঠা। খাওয়া-দাওয়া বেশীর ভাগ হোটেলে। রোটি, গোস্ত, সব্জী,—ব্যস। তারপর ডক মজুরদের কিংবা কর্পে রেশনের ধাঙড়দের হপ্তা হাজিরার দিন যখন এরা গোঁফে তা দিতে দিতে দূরে দাঁড়ায়, বেচারা মজুরদের আত্মা তিন লাফে খাঁচা ছেড়ে পালায়। আত্মা পালাক, কাব্‌লির হাত থেকে আত্মার মালিকটি কিন্তু পালাতে পারে না।

এদের সকলের ব্যবসা এক। চড়া সুদে টাকা ধার-দেওয়া। সকাল থেকে সন্ধ্যে এই ধান্ধা। মাসের পয়লা কাজের চাপ বেশি। ফালতু ব্যবসাও করে দু'চারজন। মেওয়া ফিরি, হিং বিক্রি ইত্যাদি। দু'বছর তিনবছর পর একবার দেশে যায়। লাভের টাকা জমা রেখে ফের কলকাতায়।

হাজরা রোডের মোড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে কাব্‌লিদের আড্ডায় সেদিন ঢুকেছিলাম। না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, টাকা ধার করতে নয়, স্রেফ আলাপ করতে। এদের অনেকেই চমৎকার বাংলা বলতে পারে। হিন্দী সবার ঠোঁটস্থ।

তাদেরই একজন জিয়াউদ্দিন। তিন পুরুষ থেকে এরা কলকাতায়। ঠাকুর্দা এসেছিল প্রথম। তারপর বাপ। বুড়ো বাপ এখন দেশে, কান্দাহারের পাশে পাহাড়-ঘেরা এক গ্রামে। বাপের জায়গা দখল করে এখন এখানে আছে জিয়াউদ্দিন।

বয়স বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। চেহারা আর দশটা কাব্‌লির মত মার্কামারা। কলকাতায় আছে বছর বারো।

জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে একথা-সেকথা আলাপ। ব্যবসা?—বললে,—"তা বাবুজি, খোদাতালার দোয়ায় আর বাঙ্গালীবাবুদের মেহেরবানিতে ভালোই চলছে। মগর বহুৎ হয়রানি। বে-ইমান আদমীর তো কমতি নেই।"

জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে আলাপ করে এই প্রথম জানতে পারলাম কাব্‌লিরা টাকা ধার দেয় মাসিক শতকরা ১২½ টাকা সুদে। পাঁচ শ টাকা যদি ধার দেয় তো কাগজে লেখা থাকবে হাজার টাকা। সুদের টাকা কেটেকুটে পাঁচশ'র জায়গায় গোড়াতেই হাতে আসবে মাত্র তিনশ পঁচাত্তর। কোন কারণে মূলের টাকা ফেরত না দিতে পারলে মামলা হবে কাগজে লেখা হাজার টাকার দাবিতে। তবে মামলা হয় কদাচিৎ। কোন কাবলিই মূলের টাকা ফেরৎ চায় না। মাস মাস সুদের টাকা পেলেই খুশী।

জিয়াউদ্দিন বললে—"বুঝলেন বাবুজি, কিরানীবাবুরাই হামাদের বড়া খদ্দের। মাস্টারবাবু উকিল বাবু কোন বাবুই বাদ পড়ে না। দো-চার বারিস্টারসাব্‌ ভি হামার কাছ থেকে রুপিয়া লেয়। আর লিবে না কেন? বেটির শাদী, বেটার বেমার,—হামরা হাজির। ফেৎনা রুপিয়া লাগে, লে-লেও।"

আরও জানতে পারলাম, এক কাব্‌লি একজনকে টাকা ধার দিলে অন্য কোন কাব্‌লিই তাকে আর টাকা ধার দেবেনা। তাদের মধ্যে অঞ্চল ভাগ করা আছে।

পরে শুনলাম, কি আশ্চর্য, আমাদের পরিচিত একজন একসঙ্গে তেরজন কাব্‌লির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে 'রেকর্ড' রেখেছেন।

জিগগেস করলাম—"এতগুলো গাঁট্টাগোট্টা কাঠখোট্টাকে আপনি বাড়িতে ঠেকান কি করে ?"—

মুচকি হেসে বললেন—"বাড়িতে তিনটে আলসেসিয়ান পুষেছি। তেরোজনের সুদের টাকা খরচের চেয়ে কুকুর পোষার খরচ অনেক কম।"

খালকাটুরে

ঘুরতে ঘুরতে হাজির উত্তর কলকাতার এক ছোট্ট গলিতে। 'মারাঠা ডিচ লেনে'। তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল অতীত স্মৃতি। বারাণসী, দিল্লী, মুর্শিদাবাদের তুলনায় এ শহর নবীনা। কিন্তু তার অলিতে গলিতে বহু উত্থান-পতনের, বহু কাহিনীর স্বাক্ষর। ছোট্ট গলি, ছোট্ট নামে, তবু তারও ইতিহাস আছে। কোম্পানীর আমল, বর্গীর হাঙ্গামা, ভাস্কর পণ্ডিতের হানা, ঘুম-পাড়ানি ছড়া, সেকালে ক্যালকেশিয়ানদের সন্ত্রাস,—সব কিছুই এক নিমেষে মনে এসে হানা দিল। মারাঠা খাল আজ আর নেই, কিন্তু প্রায়-বিস্মৃত এক আতংকজনক কাহিনীর স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে এই মারাঠা ডিচ লেন।

ইংরেজ সবে এসে কলকাতায় আস্তানা পেতেছে। চারদিকে নানা উপদ্রব, নানা উৎপাত। কোম্পানীর লোকেদের সব সময়ই ভয়, শহরটা বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। মাথা তুলে দাঁড়াল গড় উইলিয়াম। নানারকম ব্যবস্থা হল নিরাপত্তার, প্রতিরক্ষার। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল এক নূতন হাঙ্গামার। 'মারাঠা দস্যু আসিছেরে ঐ কর কর সবে সাজ।' বাংলাদেশের চাষীরা ভাবছে 'খাজনা দেবো কিসে,' কোম্পানীর বড়কর্তারা ভাবছেন, কলকাতা

শহরকে বর্গীর হাঙ্গামা থেকে বাঁচাই কি করে? তখন অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি।

ঘন ঘন বৈঠকে বসতে লাগল কোম্পানীর কাউন্সিলের। চারজন অফিসার পাঠানো হল শহর সার্ভে করতে। তারা রিপোর্ট দিলেন—গড় উইলিয়াম বর্গীদের উৎপাত থেকে বাঁচতে যথেষ্ট নয়। অন্য ব্যবস্থা চাই।

এদিকে সত্যি সত্যি একদিন লুটেরা বর্গীর দল কলকাতার দোরগোড়ায় এসে হাজির। শহরের মাতব্বর ব্যক্তিরা ভয়ে, ত্রাসে আতংকে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, আর দেরি নয়, প্রতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে হোক।

শহরবাসী শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন, তাঁরা নিজেদের খরচেই ৪২ ফুট চওড়া এক সুদীর্ঘ খাল কাটবেন, যাতে পূর্বদিক থেকে বর্গীরা তড়িৎগতিতে শহর চড়াও না হতে পারে। খাল হবে সাত আট মাইল লম্বা। বাগবাজার থেকে হেষ্টিংস। ১৭৪৩ সালের ২৩শে মার্চ কাউন্সিলের এক জরুরী বৈঠকে কোম্পানীও ঐ প্রস্তাবে সায় দিলেন। শুধু তাই নয়, খাল কাটা বাবদ অগ্রিম ২৫ হাজার টাকাও মঞ্জুর করলেন। ব্যস পুরোদমে খালকাটার কাজ সুরু হয়ে গেল। প্রাণের দায়ে শহরবাসী নিজেরাই নেমে পড়ল ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে। ছ'মাসে তরতর করে হয়ে গেল তিনমাইল খাল।

তারপরেই কাজ বন্ধ। কারণ প্রাণের দায় আর নেই। কি জানি কেন, বর্গীরা আর এগোল না, হানাও দিল না। হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে গেল। সুতরাং পরিখার আর কি দরকার। এদিকে পড়ে রইল এতদিনের অতি পরিশ্রমে বাগবাজার থেকে বেকবাগান পর্যন্ত কাটা সুদীর্ঘ তিন মাইল খাল,—যার নাম মারাঠা ডিচ।

দিন যায়। অপ্রয়োজনীয় ঐ খাল শহরবাসীর চক্ষুশূল হয়ে পড়ে

থাকে। সবাই এসে তার ওপর ফেলে আবর্জনা, জঞ্জাল। বছর ঘুরে বছর আসে ; একদিন দেখা যায় মারাঠা ডিচ আবর্জনার স্তূপে বুজে এসেছে। আরও কয়েক বছর যেতে না যেতেই খালের উপর তৈরী হয়ে গেল নূতন রাস্তা। তার নাম হল সার্কুলার রোড আপার এবং লোয়ার। ১৭৯৯ সালে সার্কুলার রোড পাকাপাকি ভাবে পাকা হয়ে গেল। এবং চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মারাঠা ডিচ।

মারাঠা ডিচ আর নেই। কিন্তু তার নামে আছে ছোট্ট এক গলি। এবং পুরানো কলকাতা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে দেখা যায়, সেকালের ক্যালকেশিয়ানদের উল্লেখ করা হচ্ছে ditchers বলে। কলকাত্তাইদের ঐ নাম ছিল বহুদিন।

লালদীঘির সোফার পাড়া

লালদীঘির পুব পারে, স্টীফেন হাউসের উল্টোদিকের ফুটপাত ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে সার সার গাড়ি ডজ, পন্টিয়াক, ব্যুইক, হাডসন, হিন্দুস্থান, ফিয়াট। হরেকরকম্বা। এই স্বতশ্চল রথমালার "বেকার" সারথিদের কথাই এবারে বলি।

বেকার না তো কি ? সাহেব এলেন গাড়ি হাঁকিয়ে। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়লেন কাগজের গোলকধাঁধায়। বেরোতে বেরোতে পাঁচটা ছ'টা মাঝখানে আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার টিফিন। এদিকে গাড়ির ড্রাইভারদের অবস্থা কাহিল। সময় কাটে না।

নামজাদা বিদেশী ব্যাংকের ম্যানেজার সাহেবের ড্রাইভার রসুলই এগিয়ে এসে বলল, "এই যে দেখেছেন দুপুরের রোদে তাসের আড্ডা, তা শুধু সময় কাটাবার জন্যেই। কাজ ছাড়া কাঁহাতক

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে ভাল লাগে। প্রথম প্রথম মন্দ লাগত না। গাড়ি দাঁড় করিয়ে সীটে হেলান দিয়ে ঘুমের তোড়জোড়, নয়তো কাছাকাছি পায়চারি। শেষে অসহ্য লাগে। বেকার সময় কাটতেই চায় না।"

রসুল মিঞা বিড়িটায় শেষ টান মেরে ছুঁড়ে আবার বললে,— "এক নৌকায় যাত্রী অনেক, নিউ আলিপুর থেকে এসেছে হরবিলাস, ক্যামাক স্ট্রীটের মনসুখ, সাদার্ন এভিনিউ থেকে পরেশ দাস, এলগিন রোডের আবদুল, আরও কত। সবারই হাল এক।"

প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন ড্রাইভার বসে গুলতানি মারে এই জায়গাটায়। তাদের বেশির ভাগই অবাঙালী। কয়েকজন শুয়ে আছে গাড়ির সীটে হেলান দিয়ে, কয়েকজন ঝাড়ন দিয়ে সাফ করছে গাড়ির গা। ফুটপাতে তোয়ালে বিছিয়ে তিন চারটে দল বসে গেছে তাসের আড্ডায়। ডিক্লেয়ার, টোয়েন্টিনাইন। চারজন খেলছে তো আরও চারজন হুমড়ি খেয়ে দেখছে। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় চা-ওয়ালা, ফুচকাওয়ালা। এখানকার বাজার ভাল। চটপট বিক্রি হয়ে যাবে।

শ্যোলাক কোম্পানীর বড় অফিসারের ড্রাইভার গোবিন্দ বললে, —"ঝাড়ু মারি এই চাকরির কপালে। মাইনে-পাতি ভালই, কিন্তু আর ভাল লাগে না মশায়। ঘুম থেকে উঠেই গাড়ি ঝাড়পোচ করে নিয়ে এসেছি এইখানে, তারপর একঠাঁয় বসে আছি, মাঝখানে একবার সাহেবকে নিয়ে গিয়েছিলাম ফেয়ারলি প্লেসে, তারপর আবার এইখানে এসে শালগ্রাম শিলা। নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। ওসব তাস-ফাস আমার পোষায় না। তাছাড়া, একটু নড়ারও উপায় নেই, একটু সরেছো, কি গাড়ির পার্টস হওয়া, চোর জোচ্চোররা ঘুর ঘুর ঘুরে বেড়ায়।"

গোঁফ পাকাতে পাকাতে এগিয়ে এল শিউপূজন। বলল,

—"আ-রে ভাই, হামার আরও মুসকিল। সাহেব অফিস ছোড়ে যাবে গেরাও কি ফিরপো। সিখনে।আউর চার পাঞ্চ ঘণ্টা। সাম সাত্ বাজেসে দশ্-গার্হ্তক। ধুৎতেরি।"

লালদীঘির পুব পারের মত অফিস পাড়ায় এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে গণ্ডা গণ্ডা গাড়ি রাস্তা জুড়ে পার্ক করা থাকে। তেমনি থাকে ফার্পো গ্র্যাণ্ডের সামনে মনোহরদাস তড়াগের গায়ে লাগা ফাঁকা জায়গায়। বিশেষ করে সন্ধ্যায়। সারাদিন খাটুনির পর সাহেবরা যান খানাপিনায় ফুর্তি করতে; আর এদিকে বেকার ড্রাইভারের দল আবার বটগাছের তলায়, পুকুরের পাড়টায় আড্ডা জমায়। ডাক এলেই গাড়ি নিয়ে দৌড়োয়।

লালদীঘির পুব পাড়ে যে সকল গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে তারই এক ড্রাইভার কিন্তু আমায় আশ্চর্য করে দিয়েছে।

ড্রাইভারটি বাঙালী। বয়স বেশি নয়। ত্রিশ বত্রিশ। ম্যাট্রিক ফেল। আজ সাত আট বছর একই সাহেবের ড্রাইভারী করছে। একদিন দেখি অন্য সব ড্রাইভার যখন গল্পগুজব তাসের আড্ডায় কিংবা গভীর ঘুমে মগ্ন, তখন এই বাঙালী ড্রাইভারটি একখানা 'সঞ্চয়িতা' হাতে নিয়ে বসেছে। এবং বিড়বিড় করে কি যেন বকছে।

এগিয়ে গেলাম। জিগগেস করতে একগাল হেসে বললে—"জানেন, সময় কাটাবার এই চমৎকার উপায় আমি বের করেছি গত মে মাস থেকে। সঞ্চয়িতা নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের কবিতা রোজ মুখস্থ করে চলেছি। গোটা ত্রিশেক হয়েছে। ইচ্ছে আছে, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর মধ্যে অন্তত দু'শ বড় কবিতা মুখস্থ করে ফেলব। প্রথম প্রথম একঘেঁয়ে লাগত, এখন নেশা ধরে গেছে। তাছাড়া, ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়া আমার এক বাতিক ছিল। এখন এক ঢিলে দুই পাখি মারছি আর কি।"

নগর-দর্শনে বেরিয়ে অনেক ঘুরেছি, অনেক দেখেছি কিন্তু মোটর ড্রাইভারদের মধ্যে এমন রবীন্দ্রভক্ত নজরে পড়েনি। ভাবছি, আসছে পঁচিশে বৈশাখে এই ড্রাইভার ভদ্রলোককে দিয়ে রবীন্দ্রকবিতা মুখস্থের এক 'ডেমনেস্ট্রেশান' দেব। দু' চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া, হলফ করে বলতে পারি, সব রবীন্দ্রভক্তই এর কাছে হার মানবে।

ভিকম সিং

জানি, আপনার পাগড়ি বাঁধার দরকার নেই, তবু জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিদং, যদি কোনদিন দরকার পড়ে, খবর দেবেন ভিকম্ সিংকে। কিংবা নিজেই সোজা চলে যেতে পারেন সরকারী সদর দপ্তরখানায়।

ভিকম সিং চীপ সেক্রেটারীর চাপরাশি। রাইটার্স বিল্ডিঙের দোতলায় খোদ বড়কর্তার কামরার সামনে টুলের উপর বসে থাকে। ষাটের উপর বয়স। দেখলে মনে হয় আরও কম। বেঁটেখাট চেহারা, মুখে স্মিতহাসি, সব সময়ই সদাব্যস্ত ভাব।—"সাহেব আছেন ?"—ভিকম সিং দরজা ফাঁক করে ঘরের ভেতরে দেখে এসে খবর দেবে, "আপুন হবেনা হুজুর, বাহারের সাহাব আছেন কয়েক জোন, জেরা বাদে আসুন না।"

চীফ সেক্রেটারীর চাপরাশি হলে কী হয়, তাঁর ফাই-ফরমাশ খাটার চেয়ে ভিকম সিংকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় অন্যান্য চাপরাশি-বেয়ারার মন জোগাতে। দোতলা দিয়ে যদি কোনদিন যান তাহলে দেখবেনই, ভিকম সিংয়ের টুলে বসে আছে অন্য কোন চাপরাশি, আর ভিকম সিং দশ হাত পনেরো হাত কাপড়ের রাশ

বাগে এনে পরম যত্নে ওর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দিচ্ছে। পাগড়ি বাঁধানেওয়ালে বেয়ারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

খবর নিয়ে জানলাম, ভিকম সিংয়ের মত এত ভাল পাগড়ি আর কেউ বেঁধে দিতে পারে না। রাইটার্স বিল্ডিঙের গোটা চৌহদ্দী থেকে সবাই আসে "মাথাটা ঠিক" করে নিতে। ভিকম সিং কাউকেই নিরাশ করে না। বলে, "এই ছাখুন না, সাহেব গোসা করে, তবু উয়াদের কাম হামাকেই করতে হবে। আজকাল জোয়ান লোকরা সরকারী নোকরি কোরবে লেকিন পাগড়ি ভি বাঁধতে সেকে না।" কথার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চল মূর্তির মত বসে থাকা লোকটির মাথায় পাগড়ির বাঁধন পরায়।

ভিকম সিংয়ের বাড়ি বাংলা দেশের বাইরে। অনেকদিন আছে বাংলা দেশে। এই রাইটার্স বিল্ডিংয়েই চাকরি হয়ে গেল প্রায় তিরিশ বছর। ভিকম সিংয়ের বাঁ পাশে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের ঘরের সামনাটায় আর একদল চাপরাশি বেয়ারার ভিড়। পাগড়ি খুলে হাত পা ছড়িয়ে আড্ডা মারে, আর বিজলি ঘণ্টার কিড়িং কিড়িং বাজতেই শশব্যস্ত হয়ে দৌড়োয়। এই চলছে।

তাঁদেরই একজন সেদিন আমাকে বলল—"ঐ পাগড়ীটা মাথায় পরতে ভাল লাগে না স্যার, সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্ট তুলে দিয়েছেন, আমরা এখানে কত বলেছি· তবু কেউ শুনছেন না। আমরা কেউ চাইনা স্যার, মাথায় পাগড়ি বাঁধতে।"

আর একজন বললে—"এই দেখুন না হুজুর, কয়েক বছর পাগড়ি পরতে পরতে মাথাটার কি হাল হয়েছে, চুলগুলো সব উড়ে গিয়ে বেবাক টাক। পাগড়িটা তুলে দেবার কথা একটু লিখুন না স্যার, খবরের কাগজে।"

লিখে কি কিছু কাজ হবে? স-পাগড়ি চাপরাশের মাহাত্ম্য যে অনেক।

চীফ সেক্রেটারী শ্রীরণজিৎ গুপ্ত যেদিন কাজের ভার নিলেন সেদিন ভিকম সিংয়ের সঙ্গে আবার দেখা। সাদা গোঁফের ফাঁকে ফোকলা দাঁতের হাসি ছড়িয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে ঘর-বার করছে। আজ আর অন্য বেয়ারাদের জুৎসই পাগড়ি বেঁধে দেবার মত সময় তার নেই।

ভিকম সিং বললে, "আরে, নোতুন সাহেব তো হামার চেয়ে জুনিওর, হামি কাজে আসেছি এক্কইশ সালে। অনেক ডিপারমিণ্ট ঘুরে যোখন চীফ সেক্রেটারীর ঘরে আসলাম, তখন ছিলেন টীভেনসন সাহেব। উয়ার বাদ স্থকুমার সেন, এস এন রায়, জে এন তালুকদার সাহাব। এখন আসলেন গুপ্ত সাহাব। পাঞ্চ পাঞ্চজন চীফ সেক্রেটারী হামার হাত দিয়ে গেলো। লেকিন, আর ছে হোবেনা, দুই বছর বাদ হামি রিটায়ার করবো। দুসরা আদমি হামার জায়গায় বসবে।"—

"তারপর কোথায় যাবে?—আমার প্রশ্নের উত্তরে ভিকম সিং জবাব দেয়—"কেনো, দেশে? জমিজেরাত থোরা আছে, আউর"—

উত্তর শেষ হয় না। বেল বাজে। মাথায় পাগড়ি ঠিক আছে কিনা দেখে ভিকম সিং দরজা ঠেলে চীফ সেক্রেটারীর খাস কামরায় দৌড়োয়।



শহুরে বাউল

গ্র্যাণ্ড হোটেল আর্কেডে সেই পরিচিত মুখটি আর কেন দেখি না? 'টাইশোকোটো' হাতে সেই কেতাদুরস্ত অন্ধ ভিখারীটি কোথায়?

রঙ্গে চলা চৌরঙ্গী পাড়ায় যানেওয়ালা সকল আদমিই চেনেন তাকে। তার নাম 'জন'। জাতে ক্রীশ্চান। কালোপানা লম্বা চেহারা, কলার্‌-হীন সাদা শার্ট, সাদা ফুলপ্যাণ্ট আর কালো জুতো। হাতে টাইপরাইটার ধরনের জাপানী বাদ্যযন্ত্র 'টাইশোকোটো।' পিড়িং পিড়িং বোল তুলে অনেক বছর ধরে গ্র্যাণ্ড হোটেলের তলায় সে ঘুরে বেড়ায়। পথ-চলতি লোকেরা দু'চার পয়সা, কখনো সখনো সিকিটা আধুলিটা হাতে তুলে দেয়। সে আপন মনে বাজায় আর পায়চারি করে।

চৌরঙ্গী পাড়ায় নানা দ্রষ্টব্যের মধ্যে সেও ছিল একটি। তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অনেকদিন থেকে তাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

তেমনি দেখা যাচ্ছে না প্ল্যানেড ট্রামগুমটির পাশে বসে থাকা সেই সারেঙ্গী বাজিয়েকে। দুপুর-রোদে কিংবা সন্ধ্যের অন্ধকারে সামনে গামছা পেতে দু হাঁটু গেড়ে আপন মনে সে বাজাত সারেঙ্গী। গামছার ওপর পড়ত দু'চার পয়সা। এই

লোকটিও যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। হয়ত বেশি রোজগারের আশায় অন্য কোথাও আসর পেতেছে।

ট্রাম-গুমটির আশে পাশে এই ধরনের অনেক ভিখারীর সাক্ষাৎ মেলে। কেউ বাজায় ঢোল, কেউ মন্দিরা, কেউবা সারেঙ্গী। মাটির হাঁড়িতে দু'হাত চালিয়ে তবলার মত চাটিম চাটিম বোলও তোলে কেউ কেউ। শুধু ময়দান বা ট্রাম-গুমটি নয় গোটা কলকাতাতেই ছড়িয়ে আছে এই ধরনের বাজিয়ে ভিখারীর দল। ভাঙা হাঁড়ির দু'টুকরো কিংবা শুকনো বাঁশের দু'খণ্ড খটাখট্ বাজিয়ে সস্তা হিন্দী গান গানেওয়ালা ছোকরাদেরও অভাব নেই। ঠুঙুস ঠুঙুস মন্দিরা বাজিয়ে খনখনে গলায় 'ভিক্ষে চাই মা' বলে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায় অনেকে। হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে বেদের দলও আসে। এরা সকলেই ভিক্ষের বদলে দাতার মনোরঞ্জন করতে চায়।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউর চীনে-রেস্তোরাঁ 'চুং ওয়ার' দোর গোড়ায় দু'জন বাজনদারকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন অনেকে। গীটার হাতে রোজ সন্ধ্যের পর এরা মিঠে সুরের ইংরেজী গান গায়। 'টুথপিক' দিয়ে দাঁত খুটতে খুটতে ভোজনবিলাসীরা যখন বেরোন, এরা সেলাম ঠোকে। কেউ বখশিস দেয় কেউ দেয় না। এই বখশিসেই এদের পেট চলে।

এই ধরনের এক অদ্ভুত বাজনদারের সঙ্গে একবার মোলাকাৎ হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতায় রাত যখন নিঝুম, লাইটপোস্ট আর ডাস্টবিনগুলো যখন অতন্দ্রপ্রহরীর মত পথের দু'পাশে জেগে আছে, —ঠিক সেই সময় হঠাৎ শোনা যায়, বেহালার করুণ মূর্চ্ছনা। গায়ে পাজামা-শার্ট, কালো জহর কোট। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চোখ টকটকে লাল। আর কাঁধের ওপর পুরানো রঙচটা বেহালা। সুরের গুঞ্জন তুলতে তুলতে এগিয়ে চলেছে। 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে, ডাক দিয়ে সে যায়।'

মধ্যরাত্রের নিস্তব্ধতা চুরমার করে হঠাৎ যেন এক অন্য জগতের আহ্বান। দোতলা বা তেতলার অলিন্দ দিয়ে উঁকি মারেন কোন সঙ্গীতবিলাসী কিংবা রাত-জাগা কপোতকপোতী। 'নিদ্রাহারা রাতের এ গান' শুনতে ডাক দেন বাজিয়ে লোকটিকে। সে এগিয়ে আসে, শ্রোতার মনোরঞ্জনে কাছে বসে আপন মনে বেহালা বাজায়। রাতের কলকাতা মুহূর্তের জন্যে হয়ে যায় রূপকথার। টাকা দু'টাকা বখশিস নিয়ে সে আবার পথে নামে, 'আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।'

ধীরে ধীরে সেই লম্বা ছড়ির টানের কান্না দূরে মিলিয়ে যায়। আবার মধ্যরাত্রের নির্জন নিস্তব্ধতা।

সত্য সেলুকাস

গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডার শহর কলকাতার কথা ভেবেই কি সেনাপতি সেলুকাসকে বলেছিলেন 'কি বিচিত্র এই দেশ?' কেননা এমন হাজার জাতের মেলা ভারতের কোন শহরে পাওয়া যাবে না। শক হুন দল পাঠান মোগল এই কলকাতার দেহে লীন। আর বিদেশী? তাঁরাও কম যান না। পৃথিবীর প্রায় সব জাতই ছড়িয়ে আছেন অলিতে গলিতে। আলেকজাণ্ডারের জাতভাই প্রবাসী গ্রীকদের সম্পর্কে এবারে কিছু বলি।

আলেকজাণ্ডার, সেলুকাসের মত মেগাস্থিনিস, মীনাণ্ডার, হেলিওদোরাস, প্লাটিনাস প্রমুখ ভারত প্রবাসী গ্রীক কীর্তিমানদের নাম আমাদের সকলেরই জানা। সাহিত্য, শিল্পে গ্রীক প্রভাব ফেলনা নয় কিন্তু পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বাংলা দেশে গ্রীক প্রভাব এসেছে

অনেক পরে। যতদূর খবর পেয়েছি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ'দুয়েক গ্রীক ঢাকা-কলকাতায় এক উপনিবেশ গড়ে তোলেন।

কলকাতায় প্রথম গ্রীক চার্চ খোলেন ফাদার নিকিফোরোস। ১৭৩০ সালে আমড়াতলা ষ্ট্রীটে। তারপর আরও ১২ হাজার টাকা (ওয়ারেন হেস্টিংস চাঁদা দেন ২ হাজার টাকা) খরচ করে গির্জে বড় করা হল। ১৭৮০ সালে।

কলকাতার প্রবাসী গ্রীকরা ব্যবসা-বাণিজ্যেই বেশ দু'পয়সা কামাত। বিশেষ করে পাটের ব্যবসায়। এক সময় ছিল যখন ওদের সংখ্যা প্রায় হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়। কমতে কমতে সে সংখ্যা এখন শ'দেড়েক।

প্রবাসী গ্রীকদের একদা-প্রভাব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে শহরের বহু বাড়িতে গ্রীক স্থাপত্য-রীতির হুবহু অনুকরণ। তাছাড়া, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে, কালীঘাট ট্রাম ডিপোর গায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় এক গ্রীক-গির্জে। প্রাচ্য দেশে এটিই একমাত্র গ্রীক অর্থোডোক্স কম্যিউনিয়ন চার্চ। গ্রীসিয়ান স্টাইলের এই বিখ্যাত গির্জেটি প্রবাসী গ্রীক ব্যবসায়ীরা ১৯২৪ সালে আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী করান। গির্জের প্রধান হচ্ছেন রেভারেণ্ড অর্চিম্যানড্রাইট আলথানাসিয়স নিকোলা আলেক্সিউ। তিনি কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লি, করাচী, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রেঙ্গুন, কলম্বো ইত্যাদি কাছাকাছি সব জায়গার গ্রীকদের ধর্মপ্রধান। ১৯৩৫ সালে গ্রীসের রাজা জর্জ যখন কলকাতায় আসেন, তিনিও এই গির্জের উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন।

এই গির্জে ছাড়া প্রবাসী গ্রীকদের নিজস্ব এক কবরখানা আছে নারকেলডাঙ্গায়। এইটি বানান হয় সম্ভবতঃ এক শ' বছর আগে। কবরখানায় ঘুরলে অনেক জাঁদরেল জাঁদরেল 'হেলাজ-তনয়ের'

নাম পাওয়া যায়। ফলক দেখে দেখে আন্দাজ করা গেল, এই কবরখানায় যিনি সর্বপ্রথম সমাধিস্থ হন, তাঁর নাম আলেকজাণ্ডার আর্পেইরি। এক গ্রীক ব্যবসাদার। তিনি মারা গিয়েছেন ১৭৭৭ সালের ৭ই আগস্ট।

টাকার গাছ

রূপকথার নয়, সত্যিকারের টাকার গাছ আছে কলকাতায়,—নাড়া দিলেই ঝম্ঝম্ করে পড়ে। নেহাৎ অবিশ্বাসী না হলে আমার সঙ্গে চলুন সেই গাছের সন্ধানে। কম পক্ষে পঁচিশ-তিরিশটি গাছ ছড়িয়ে আছে গোটা শহরে।

বুঝতে পারছি, আমার লেখা পড়ে আপনার লোভী চোখ দুটো নয়া আধুলির মত চকচক করছে। ভাবছেন, আহা-হা, এমন কথাটা সবার কাছে ফাঁস করে দিলেন কেন, চুপিচুপি একজন বা দু'জনকে ডেকে বললেই তো হত। এমন একটা গাছ হাতের কাছে পেলে চাকরির কী দরকার, ছেলের স্কুলের বেতন, মেয়ের দুধের দাম, পাঁচ ছটি লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান,—এসব করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলারই বা কি দরকার। নাড়ো গাছ, ফেল কড়ি, মাখো তেল। কিন্তু কোথায় সেই গাছ?

আছে, আছে, আছে। "ঈশান কোণে ঈশানী, বলে দিলাম নিশানি।" আমার সঙ্গে চলে আসুন যে-কোন পাবলিক টেলি-ফোনের খুপরি ঘরে। সেইখানেই আপনার ইপ্সিতের সন্ধান মিলতে পারে। ঐ যে চৌকো কালো বাক্স মাথায় নিয়ে এবং ডান পাশে লম্বা দুটো সাদা দাঁত বের করে কিম্ভূত কিমাকার জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে, ঐটেই সেই সত্যিকারের টাকার গাছ। রূপোর ডালে

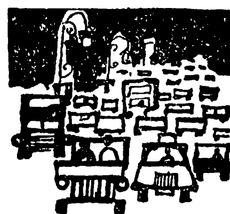
সোনার পাতা, মুক্তোর ফল, চুণীর ফুল, ডালে ডালে হীরামন পাখি —সে গাছ তো রূপকথার ; এ গাছ বিজ্ঞানের যুগের।

পাবলিক টেলিফোন বুথে আছে এ এবং বি মার্কা ছুটো বোতাম। উপরের ফুটোয় তিন তিনটে পাঁচ নয়া পয়সা ফেলে উল্টো দিকের কথা শুনতে হলে টিপতে হয় এ মার্কা বোতাম, কানেক্শন না হলে এ-মার্কার বদলে বি-মার্কা বোতাম টিপলেই ফুটোয় ফেলা পনের নয়া পয়সা ফেরৎ পাওয়া যায়। শহরের অনেকগুলো পাবলিক টেলিফোন বুথে রোজ শত শত লোক ফোন করে। সামনেই ইংরাজিতে লেখা থাকে বোতাম টেপার কায়দা ; কিন্তু অনেক সময় কি হয়? এমন বহু লোক আছেন যাঁরা কানেকশন না পেলে বি-মার্কা বোতাম না টিপেই চলে যান, ফুটোয় ফেলা পয়সাটা গচ্চা দিয়ে ভাবেন, কানেকশন হোক আর নাই হোক, পনেরো নয়া পয়সা দিতেই হবে। একবার ফুটোয় পড়লতো গেল। এরকম ঘটনা প্রতিদিন বরাবর ঘটছে এবং নূতন কল না হওয়া পর্যন্ত ঐ পয়সা উদ্গারের অপেক্ষায় বাক্সে জমা থাকে।

কলকাতায় এক ধরনের লোক আছে যাদের কাজ হচ্ছে পাবলিক টেলিফোনের বুথগুলো ঘুরে ঘুরে বি-মার্কা বোতাম টেপা। তারা প্রায়ই ঠকাস্ ঠকাস্ করে পর পর তিনটি পাঁচ নয়াপয়সা বের করে ফেলে। এই বুথে হলো না তো অন্য বুথে। কোথাও না কোথাও মিলবেই, অন্তত একবার। শহরে 'গাঁইয়াদের' সংখ্যা তো কম নয়।

আমি এমন একজনকে জানি, যার সামনে টেলিফোন বুথ পড়লেই হাত নিসপিস করে। রাস্তায় বেশ বেড়াচ্ছে, ফুটপাত ধরে হাঁটছে, হঠাৎ একটা বুথ। ব্যস ছুটে গিয়ে বি-মার্কা বোতাম টিপে ফেললো। ফিরে এসে বলল, "না হল না।" আবার একটা বুথ। বোতাম টিপে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বলল—"যাক বাবা, ছু কাপ চায়ের পয়সা হয়ে গেল।"

এই হচ্ছে আপনার সেই টাকার গাছ। পুরো পরিবার প্রতি-পালনের ভরসা করবেন না, হঠাৎ যদি কোনদিন দু'এক কাপ চায়ের পয়সার বা বাড়ি ফেরার বাসের পয়সার দরকার হয়, তাহলে ঐ গাছের খোঁজ করতে পারেন। আপনার বরাত ভালো থাকলে কিছু না কিছু মিলবে। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি এই লেখা পড়ে টেলিফোন বিভাগের লোকেরা অন্য কোন ব্যবস্থা না নিয়ে থাকেন তবেই।



বাঘের সওয়ার

হুংকার ছেড়ে অতিকায় 'ডায়নোসোর' হঠাৎ থেমে গেল। তার পেটে ঠাসাঠাসি এক দঙ্গল লোক হুমড়ি খেয়ে পড়ল একে অন্যের ঘাড়ে। ভেতরে বাইরে শোনা গেল কোরাস-চীৎকার—"গেল, গেল, গেল।" অর্থাৎ বড় রকমের এক দুর্ঘটনা থেকে সবাই বেঁচে গেল।

ডায়নোসোর-রূপী স্টেট বাসের ড্রাইভার বেচারা কিন্তু বাঁচার পথ পেল না। দুর্ঘটনার সীমান্ত থেকে গিয়ে পড়ল স্রেফ তোপের মুখে।

ফুটপাতের লোকে বাস ঘেরাও। বাস-যাত্রীদের হম্বিতম্বি শতমুখী। ভেতরে বাইরে সবার মুখে ফুটছে খই।—"মাতাল, পাঁড় মাতাল, নির্ঘাত টেনেছিল, নইলে—", "খুনে ব্যাটাকে আচ্ছাসে ধোলাই দেওয়া দরকার",—"গুণ্ডা মশাই, সাক্ষাৎ গুণ্ডা, আর একটু

হলেই বাচ্চা ছেলেটাকে পিষে ফেলছিল",—পুলিস-টুলিস নয়, নিয়ে আস্থন এইখানে, ওর হাড় বাছাই করব আজ"—"আমাদের পাড়া থেকে খুন করে পালাবে, দেখি কত মুরোদ"—"নেমে আয়,"—"দে পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়ে দে"—চারদিকে মার মার কাট কাট, লোকজনের ভিড়, হৈ চৈ। ড্রাইভার ভয়ে কাঁপছে, কণ্ডাক্টর হতভম্ব। ছু জনেরই মুখ 'ব্লটিং-পেপার।' আর বাস?—'ন-যযৌ ন-তস্থৌ।

ছাতা বগলে, পান চিবোনো অফিসযাত্রীরাও ছুটে এসেছেন। আসছে পাড়ার ছেলেরা। একদল থাকছে, একদল যাচ্ছে। যাবার বেলায় কেউ টিপ্পনী কাটছেন—"ছাড়বেন না মশাই, ওরা মহা বজ্জাত, হামেশাই ওসব হচ্ছে।—"আমার হয়ে ছু ঘা বেশি লাগিয়ে দেবেন দাদা"—চলতি রিক্সা থেকে মুখ বাড়িয়ে আর একজন মন্তব্য ছুঁড়লেন।

একজন ছুটে এলেন হন্তদন্ত হয়ে।—"কজন? মারা পড়ল ক'জন? একেবারে থেৎলে গেছে বুঝি? আহারে! কি আশ্চর্য এরই মধ্যে পুলিস ডেড্-বডি সরিয়ে নিয়েছে? কি সর্বনাশ! নাঃ আর বাঁচা গেল না এই গবর্নমেন্টের আমলে। বেগুনের সের বারো আনা, চালে কাঁকর, তার উপর স্টেট বাসের ছুর্ঘটনা—"

ওদিকে ট্রাম অচল, গাড়িঘোড়া অচল, গোটা রাস্তার ট্রাফিক বন্ধ। ড্রাইভারকে যখন ছিঁড়ে কুটি কুটি করবার উপক্রম, সেই মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চে পুলিসের আবির্ভাব। আরও কিছু কথা কাটাকাটি। অবদমিত জিঘাংসা পরদিনের জন্যে জমা রেখে অবশেষে "ক্রুদ্ধ জনতার" প্রস্থান।

এ ধরনের দৃশ্য কলকাতার রাজপথে প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। সেদিন টালিগঞ্জ এলাকায় সরু রাস্তা দিয়ে স্টেট বাস যাচ্ছে। এ পাশে বাড়ি, ও পাশে খানা, পেছনে গাড়ি, সামনে গাড়ি, পাশে

গাড়ি। হঠাৎ গলি থেকে ছুটে এল এক বাচ্চা ছেলে। দৌড়ে রাস্তা পেরোতে না পেরোতেই বাঁক ঘুরে স্টেট বাস। আর একটু হলেই গিয়েছিল চাকার তলায়। শেষ মুহূর্তে অতি কষ্টে গাড়ি কাৎ করিয়ে ব্রেক না কষলেই হয়েছিল কেলেংকারী। বাচ্চা ছেলে অন্য গলি দিয়ে হাওয়া। কিন্তু তার শুভানুধ্যায়ীর দল নারায়ণী সেনার মত ঘেরাও করল বাসকে। এবং তার পরের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত অথচ রোমাঞ্চকর। অর্থাৎ উপরে বর্ণিত কাহিনী।

সেদিন আলাপ হচ্ছিল, এক স্টেট বাসের ড্রাইভারের সঙ্গেই। বললে ঃ

—"দাছু, আমাদের সবদিকে মুশকিল। একেবারে শাঁখের করাত। এদিকে ওদিকে, ছুদিকেই কাটে। গাড়ি যদি আস্তে চালাই প্যাসেঞ্জার তৎক্ষণাৎ খাপ্পা। হাড় জ্বালানো মন্তব্যে গাড়ি ভরে যাবে। কেউ বলবেন—"না, বেটা ড্রাইভার অফিস লেট করিয়ে ছাড়বে দেখছি। বাবু চলেছেন যেন গজেন্দ্র গমনে"। আর একজন বলবেন—"বেটাদের প্রাইভেট বাসের পাঞ্জাবী ড্রাইভারদের দেখেও শিক্ষা হয় না।" সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের চীৎকার—"হেই ড্রাইভার স্পীড বাড়াতে পারো না? আফিম খেয়ে চালাচ্ছো নাকি?"—আর যেই একটু স্পীড দিতে গেলাম, প্যাসেঞ্জাররা রেগে আগুন। আবার মন্তব্যের ঝড়—"দেখো দেখো, কি রকম মাতালের মত চালাচ্ছে। হেই ড্রাইভার অমন ঝড়ের মত না চালালে কি ভাত হজম হয় না, যত সব শয়তান জুটেছে স্টেটবাসের চাকরিতে।" —এই তো অবস্থা। আস্তে চালালে আফিমখোর, জোরে চালালে পাঁড়মাতাল। এখন আমরা যাই কোথায় বলুন তো? অনেক সময় মেজাজ গরম হয়ে যায়। খাঁচার ভেতর স্টিয়ারিং-হাতে এক নাগাড়ে ছ'সাত ঘণ্টা বসে কার মেজাজ ঠিক থাকে বলুন। কিন্তু

কোন কথা বলার উপায় নেই। একটু আপত্তি করলেই সবাই আমার মাথা কেটে নেবে।"

"তাছাড়া দেখুন রাস্তার অবস্থা!—ড্রাইভারটি একটু থেমে আবার বললে—"সরু সরু গলির একফালি রাস্তা। তার উপর ট্রাম, ঠেলা, ষাঁড়, ফুটপাত-উপচানো মানুষ, গাড়ি, ঘোড়া, বাজার-হাট হেনতেন সবকিছু। দাঁড় করানো ইটবোঝাই লরীকে পাশ কাটিয়ে ছুটো ঠেলার ফাঁক দিয়ে খোলা ড্রেনের গা ঘেঁসে, স্বচ্ছন্দ-বিহারী ষাঁড়ের গায়ে আঁচড় না লাগিয়ে ট্রাম, ট্যাক্সি আর অসংখ্য পথচারীর ফাঁক-ফুকুর দিয়ে পাঁচগুণ প্যাসেঞ্জারে বোঝাই এতবড় ঢাউস স্টেটবাস বের করে নিয়ে আসতে কতখানি হিম্মত দরকার, তা আপনারা বুঝবেন না।—আরও আছে। দেখবেন, ঠিক ভিড়ের সময় তিন চারজন মিলে রাস্তার ওপরেই বেশ আড্ডা জুড়ে দিয়েছে। কেউ দাঁত খুঁটছেন, কেউ ভুঁড়িতে হাত বুলাচ্ছেন, কেউ বন্ধুর কথায় হেসে কুটিকুটি। বিশ্রম্ভালাপের এমন চমৎকার স্থান সচরাচর মেলে না। ওদিকে আমি হর্ণ বাজিয়ে বাজিয়ে হয়রান। কে কার কথা শোনে। বেশি কিছু বললেই আবার তেড়ে আসবে। অগত্যা অতি কষ্টে পাশ কাটিয়ে কোনক্রমে এগোই। পাশ কাটাতে গিয়ে বাসে ঝাঁকুনি। ব্যস, প্যাসেঞ্জারেরা তেরিয়া। কতদিক সামলাবেন। এই শেষ নয়। আরও আছে। সরু রাস্তার বাঁক ঘুরছি। হঠাৎ আইস ক্রীম হাতে খালি গায়ে, নোংরা হাফপ্যান্ট পরা দশ বছরের এক ছেলে রাস্তার এপার থেকে ওপারে মারল দৌড়। শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষারও সময় নেই। ব্যস হয়ে গেল। আমার হাড় কটিও গুঁড়ো হয়ে গেল। এখন আপনি বলুন দাদু, আমরা কোথাই যাই। আমাদের দোষে মাঝে মাঝে দু-একটা দুর্ঘটনা হয় ঠিকই কিন্তু যদি বলেন সব দুর্ঘটনাই আমাদের দোষে হয়

তাহলে আমি আপত্তি জানাব। বরং আপনারাই সব দিক বিবেচনা না করে এককথায় আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন আসামীর কাঠগড়ায়। দুই একজন প্যাসেঞ্জারের কথা শুনলে মনে হয়, আমরা যেন মানুষ খুন করতেই যন্ত্র নিয়ে পথে বেরিয়েছি। এত নির্দয় হবেন না। আমাদের অসুবিধের দিকটাও ভেবে দেখবেন। আচ্ছা দাদু (আবার 'দাদু' ?) চলি, নমস্কার।"

আমার চেয়ে বয়সে দ্বিগুণ এই নাতিটি অস্বস্তিকর 'দাদু' সম্বোধনে বারবার আপ্যায়িত করে চলে গেলেন। হাজরা রোডের স্টেটবাস স্টপে আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি। হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখি, সবশুদ্ধ এই হল পঁয়ত্রিশ মিনিট। এখনও চৌদ্দ নম্বর বাসের সাক্ষাৎ নেই। দুই গেল, পাঁচ গেল, চার ছয় সব গেল, চৌদ্দ নিরুদ্দেশ। ড্রাইভারের সঙ্গে এতক্ষণ আলাপে সম্প্রতি যেটুকু সহানুভূতি জেগেছিল স্টেট বাসের উপরে, তার সবটুকুই আবার ফুৎকারে মিলিয়ে গেল। এত বড় 'বিবেচক' আমার কণ্ঠেও শোনা গেল—"যেমন গবর্নমেন্ট, তেমনি স্টেট বাস, তেমনি তার সময়জ্ঞান।"



পার্কের বেঞ্চিতে

সকালবেলা যদি কলকাতার কোন পার্কে বা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসেন, তাহলে অনেক মজার মজার গল্প শুনতে পাবেন। ঐ সময় পাড়ার বুড়োদের আসর বসে। মোজা কম্ফর্টার জড়ানো পেন্সনভোগীর দল লাঠি ঠকঠক করে এসে দল ভারী করেন। এক শীতকালের ধাক্কায় দু'একজন কমেন, শূন্য স্থান পূর্ণ করেন নূতন কেউ।

আলোচনার প্রধান বিষয় ছেলের চাকরি, মেয়ের বিয়ে, নিজের পেন্সন, গিন্নির মেজাজ। তাছাড়া আছে পাড়ার কোন "কেচ্ছা কেলেংকারীর" ঘটনা। রসালো করে এক একদিন এক একজন বলেন। কোন কোন সময় মজার মজার গল্পও শোনা যায়।

সেদিন দৈবক্রমে দেশবন্ধু পার্কে আমিও হাজির। বিশ্বাস করুন, আমি বুড়োর দলে কেউ নই। আমি ছিলাম তিন বেঞ্চি তফাতে। কানে এল, এক বুড়ো বলে চলেছেন—

"স্বর্গে প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন বসেছে। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ঘানা, চীন, চিলি, কানাডা, পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীরা জড় হয়েছেন। ভগবান বসে আছেন সিংহাসনে। এক একজন প্রধানমন্ত্রী আসছেন, আর ভগবান সিংহাসন থেকে উঠে সবার সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করছেন।

ভগবানও বিলিতি কায়দা শিখে নিয়েছেন। ম্যাকমিলান এলেন, হ্যাণ্ডশেক হল, উ নু, নেহরু, কৈরালা এলেন হ্যাণ্ডশেক হল! প্রত্যেকবারই ভগবান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এলেন। খানিক বাদেই এলেন পাকিস্তানের আয়ুব খাঁ। ভগবান সিংহাসনে বসে বসেই করমর্দন সারলেন। সবাই অবাক, আয়ুবের বেলায় এ ব্যক্তিক্রম কেন? কেন তিনি সিংহাসন ছেড়ে উঠে এলেন না। আমাদের নেহরু তো প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ জানিয়ে বসলেন, স্বর্গের মত "সেক্যুলার স্টেটে" পাকিস্তানের প্রতি এই অবিচার কেন?

ভগবান মৃদু হেসে নেহরুকে বললেন—"বৎস উতলা হয়ো না, আমারও তো ভয়ডর আছে। আয়ুবও আমার স্নেহের পাত্র। কিন্তু সিংহাসন ছেড়ে উঠিনি, কারণ ভয় হল যদি ফাঁকা পেয়ে আমাকে ঠেলেঠুলে আয়ুব ঐ সিংহাসনেই বসে যায়? তাহলে? তাহলে যে আমার রাজত্বই যায়।"

আয়ুব কটমটিয়ে ভগবানের দিকে তাকান।

রুশী কম্যুনিজমের বিবর্তন সম্পর্কে আর একদিন এক ভদ্রলোক দেশপ্রিয় পার্কে বসে চমৎকার কথা বলছিলেন। এমন মৌলিক গবেষণা সচরাচর শোনা যায় না।

ভদ্রলোক বললেন, "মশাই অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, চুল দাড়ি-গোঁফের সঙ্গে কম্যুনিজমের একটা অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষ করে রুশ দেশের সাম্পতিক ইতিহাসের সঙ্গে চুল-দাড়ি একেবারে একাত্ম।"

আশপাশের চার-পাঁচটি সবিস্ময় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভদ্রলোক আরও বললেন—"এই দেখুন না কার্ল মার্ক্স,—কম্যুনিজমের বাল্মীকি বেদব্যাস। তাঁর চেহারাটা কি রকম? চুলে-গোঁফে-দাড়িতে সারা মুখ আফ্রিকার জঙ্গল। মার্ক্সের পর

লেনিন। লেনিনের মুখে চুল-দাড়ির আতিশয্য মোটেই নেই। তাঁর চুল আছে, গোঁফ আছে, তবে মার্ক্সের তুলনায় দাড়ি অনেক ছোট হয়ে চিবুকে গিয়ে ঠেকেছে। লেনিন বিদায় নিলেন, এলেন স্ট্যালিন। আবার সেই চুল-দাড়ি-গোঁফের বিবর্তনবাদ। স্ট্যালিনের চুল আছে, ইয়া মোটা গোঁফও আছে, কিন্তু গালে চিবুকে দাড়ি বিলকুল সাফ! স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর গদিতে বসলেন মালেনকভ্। তাঁর নাড়ুগোপাল চেহারার দিকে তাকান। দেখবেন, দাড়ি নেই, গোঁফ নেই, থাকার মধ্যে শুধু চুল। মালেনকভের পর আসরে নেমেছেন ক্রুশ্চফ। তাঁর চেহারার কথা আশা করি আপনাদের বলে দিতে হবে না। চুল নেই, গোঁফ নেই, দাড়ি নেই, কিছু নেই। যেন রঙ দিতে বাকি কুমোরটুলির কোন অসমাপ্ত পুতুল। এখন দেখলেন তো মশাইরা, চুল-দাড়ি গোঁফের সঙ্গে রুশী কম্যুনিজমের সম্পর্কটা কত নিবিড়। প্রথমে চুল-দাড়ি-গোঁফ। পরের ধাপে শুধু চুল। বর্তমানে তাও নেই।" গবেষণার ফলশ্রুতি শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ আর একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "ক্রুশ্চফের পর কী হবে বলতে পারেন? চুল-দাড়ি-গোঁফের পাট তো ক্রুশ্চফের সঙ্গে সঙ্গেই চুকল।"

"কি আবার হবে"—গবেষক ভদ্রলোকটি নিরাসক্ত গলায় বললেন—"তারপর থেকে হয়ত মাথাই থাকবে না।"

তৃতীয় গল্পটি শোনা গেল রবীন্দ্রসরোবরের এক বেঞ্চিতে। সেখানে বুড়োদের এক আসরের অনতিদূরে আমি উপস্থিত ছিলাম। খুচরো কথার ফাঁকে একটি সুন্দর গল্প কানে এল।

কথা হচ্ছিল রেস-খেলা আর কলকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠ নিয়ে। একজন বললেন, ময়দানের ভেতর এতখানি জায়গা

রেসের জন্যে রেখে দেওয়া ঠিক নয়। নিতান্তই যদি রেস খেলতে হয়, তাহলে মাঠটিকে সরানো হোক শহরের উপকণ্ঠে। যেমন আছে টালিগঞ্জে।

অন্য জনের মতে, রেস খেলাটাই আইন করে থামিয়ে দেওয়া উচিত। এইটেই নাকি ঘরে ঘরে সর্বনাশের মূল।

তুই বক্তব্যের সমর্থনে তু'টো ভাগ হয়ে গেল। অবশেষে তৃতীয় একজন ফাঁদলেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ নিয়ে এক গল্প। গল্পে নারী-সমাজের বয়স নিয়ে যদি কোন কটাক্ষ থাকে তো আমি নাচার। এক্ষেত্রে আমার ভূমিকা কথকের। গল্পটি এই ঃ—

এক ভদ্রলোক বিয়ের পর গেছেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সঙ্গে নবপরিণীতা স্ত্রী। ভদ্রলোক বাজির পর বাজি হারছেন। মনিব্যাগের প্রায় অন্তিম দশা। হঠাৎ তাঁর এক খেয়াল হল। বৌকে বললেন—"দেখো, তোমাকে নিয়ে এবার শেষমেষ লাক্ ট্রাই করি। অবশিষ্ট গুটিকতক টাকা দিয়ে শেষ বাজি ধরি।"

বৌ বললেন—"কি রকম?"

পত্নীগত প্রাণ স্বামী বললেন,—"তোমার যত বয়স, ঠিক তত নম্বর ঘোড়া এবার বাজি ধরব, দেখি তোমার বরাত কেমন।"

বৌ রাজী। খানিক ভেবে বললেন,—"ধর উনিশ নম্বর ঘোড়া।" তাই সই। ভদ্রলোক মরীয়া হয়ে উনিশ নম্বর ঘোড়ার পেছনে শেষ সম্বল ঢাললেন।

দৌড় শুরু হল। উনিশ নম্বর ঘোড়া সবার আগে ছুটছে। ছুটছে ছুটছে ছুটছে। ভদ্রলোক আনন্দে প্রায় আত্মহারা। শেষ মুহূর্তে এক "অঘটন।" ফার্স্ট হল উনিশ নয়, সাতাশ নম্বরের ঘোড়া। উনিশ অনেক পিছনে। ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসেন।

এদিকে আর এক কেলেঙ্কারী। সাতাশ নম্বর ফার্স্ট হল দেখে ভদ্রলোকের বৌয়ের অচিরাৎ পতন এবং মূর্ছা। মূর্ছার মধ্যেই

ভদ্রমহিলার একটি স্বগতোক্তি শোনা গেল,—"হায় হায়, কেন সাতাশই বললাম না।"

গোবেচারী ভদ্রলোক কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল তাকান। বুঝ লোক যে জান সন্ধান।

প্রবাসী অন্ধ

শহরটা তবে কাদের ?—মাঝে মাঝে মনে হয়, এ শহরে বাঙালীরাই বুঝি সংখ্যালঘু! এ পাড়ায় মাড়োয়ারী, ও পাড়ায় পাঞ্জাবী, এদিকে হিন্দুস্থানী, ওদিকে মাদ্রাজী। দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাঙালীরা হটতে হটতে শহর-বেড় দেওয়া রেললাইনের ওপারে আস্তানা পেতেছেন, ওদিকে শহর প্রায় হাত ছাড়া।

আর কোথাও নয়, খাস বাঙালী পাড়া বালিগঞ্জে চলুন, দেখবেন লুঙ্গি-চাদর, ইডলি-দোশের কেমন ভিড়। মাদ্রাজী হোটেল-রেস্তোরাঁ, লণ্ড্রী, সেলুন, আর 'আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়ম্'। রাস্তায় হাঁটলে দক্ষিণ ভারতীয় কলকাকলিই শুনতে পাবেন বেশি। যেন কাঁসার ঘটিতে গোটা দশ আস্ত সুপুরি ফেলে কেউ নাড়ছে। বাঙালী বাড়িওলা প্রথমে জানতে চান, ভাড়াটে বাঙালী কিনা। হলে 'নৈব নৈব চ।' আর দক্ষিণ ভারতীয় হলে? "স্বাগতম, সুস্বাগতম, আজ্ঞে, বাড়িখানাতো স্রেফ আপনাকে ভাড়া দেবার জন্যেই বানিয়েছি।"

অবস্থা এই। সুতরাং বাঙালীরা তো কোণঠাসা হবেই। বাড়ি খালি হচ্ছে, আর ইড্‌লি-দোশের আসর বসছে। ডাল-চচ্চড়ির জায়গা নেই।

দক্ষিণ ভারতীয়ের মধ্যে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়ী সব ভাষীই আছেন। তার মধ্যে তেলেগুভাষীর সংখ্যাই বেশি।

কলকাতায় তাঁদের সংখ্যা লাখের কম নয়। তাঁরা ছড়িয়ে আছেন শহরের নানা পাড়ায়। বেশির ভাগ আছেন গার্ডেনরীচে আর বালিগঞ্জে।

সাত আট শ মাইল পাড়ি দিয়ে কবে থেকে এঁরা কলকাতায় আস্তানা পাততে শুরু করেছেন, তা গবেষণার বিষয়। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বড় রকমের তেলেগুভাষী-আগমন সুরু হল বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে। এখনও দেখা যায় বি-এন-আর—বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে বেশির ভাগ অন্ধ্রবাসী চাকরি নিয়ে আছেন। তা ছাড়া অনেকে আছেন বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, এবং সরকারী চাকরিতে। ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন কেউ কেউ। আয়া, খানসামা, গৃহভৃত্যের কাজে তেলেগুভাষীদের সংখ্যাও কম নয়।

খিদিরপুর গার্ডেনরীচ এলাকায় যাঁরা আছেন তাঁদের প্রায় সবাই রেলের চাকুরে। ক্লার্ক স্টেনো-টাইপিস্ট। বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত। একটু যাঁরা উচ্চবিত্ত তাঁদের আবাস বালিগঞ্জে। এঁদের সবাই প্রায় মার্কেন্টাইল ফার্মের বা সরকারের বড় চাকুরে। ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীট, পার্ক স্ট্রীট এলাকায় যাঁরা থাকেন, তাঁদের বেশির ভাগই খানসামা, গৃহভৃত্য, ড্রাইভার। কেউ কেউ দিন মজুর।

এঁদের সকলের সমস্যা নানা ধরনের। কিন্তু ছোট বড় মাঝারি সকল অন্ধ্রবাসীরই প্রধান সমস্যা ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা আর বিয়ে। স্থানীয় অন্ধ্রবাসীদের সঙ্গে প্রবাসীরা নাকি বিয়ে দিতে নারাজ। তার জন্যে দেশে যেতে হয়। সেখানেই হয় পাকা কথা, পাকা ব্যবস্থা। অনেক পড়াশোনার জন্যে ছেলেমেয়েদের দেশে

পাঠিয়ে দেন। তাই বছর ঘুরতে না ঘুরতেই প্রত্যেক অন্ধ্রবাসীর একবার অন্তত দেশে যাওয়া চাই।

তেলেগুভাষীরা মিশুকে। স্থানীয় বাঙালীদের সঙ্গে এঁরা সহজে মিশে যেতে চান। তাঁদের নিজেদের মধ্যেও কয়েকটি সমিতি, ক্লাব আছে। কয়েকটি সিনেমা হলে রবিবারে রবিবারে তেলেগু সিনেমা দেখানো হয়। একবার এক আসরে তেলেগু থিয়েটারও আমি দেখেছি।

কলকাতায় তেলেগুভাষীদের প্রধান আড্ডা 'অন্ধ্র সমিতি।' তাছাড়া বালিগঞ্জে তেলেগু ভাষার একটি হাইস্কুল আছে। খিদিরপুরে আছে তেলেগুভাষার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর আছে সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি আলোচনার জন্যে অন্ধ্র সাহিত্য পরিষদ, নারায়ণ নাট্যমণ্ডলী প্রভৃতি। প্রায়ই তাঁদের অনুষ্ঠান ও আসর বসে।

কলকাতায় এক যুবকের সঙ্গে সেদিন আলাপ। নাম লক্ষ্মণ রাও। রেলে চাকুরি করেন। বছর তিন কলকাতায় এসেছেন।

লক্ষ্মণ রাও বললেন, "এ শহরে এসেই প্রথমে বুঝতে পারলাম, এখানে সব জিনিসেরই দাম, সস্তা শুধু একটি জিনিস। তা' মানুষের জীবন।"

কফির বাটিতে 'সুরুৎ সুরুৎ' চুমুক দিতে দিতে মিস্টার রাও আরও বললেন, "গাড়ির ধাক্কায় লোক মরছে, বাস থেকে পা পিছলে লোক মরছে, ষাঁড়ের গুঁতোয় লোক মরছে, গুলীর ঘায়ে লোক মরছে, একটা না একটা অপমৃত্যু রোজ লেগেই আছে। আমাদের দেশের শহরে এমন জিনিস ভাবতেই পারি না।"

"আর মজাটা দেখুন"—রাও বলে চলেছেন—"এমনই হয়ে গেছি আমরা, কোন মৃত্যুকেই আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এক একটা জীবনের দাম যেন কিছু নয়। বেলা দশটা। বাসে ঝুলতে

ঝুলতে চলেছি। ভীষণ ভিড়। এমন সময় 'গেল গেল' চীৎকার। চলতি বাসের পা-দানি থেকে হড়কে মুখ থুবড়ে একজন পড়ে গেছে রাস্তায়। থেঁতলে গেছে নাক, চোখ। সারা গায়ে রক্তের দাগ। মিনিট খানেকের জন্যে অন্য বাসযাত্রীদের 'আহা-উহু' হা-হুতাশ। ব্যস এটুকুই। তারপর, পুলিসের হেপাজতে লোকটিকে ছেড়ে অন্য বাসে আবার দৌড়। একমিনিট দাঁড়াবার সময় নেই যে। অফিসের সময় হয়ে গেছে। একজন মানুষের জীবনের চেয়ে অফিসই যেন বড়। একটা ছুটো ঘটনা নয়, এমনি হরদম চলছে। কারও ফুরসৎ নেই, অন্যদিকে তাকাবার সময় নেই। ছুটছে, সবাই ছুটছে। আমিও ছুটছি। এই তো অবস্থা।"

লক্ষ্মণ রাও একটু দম নেন। আবার বলেন, "তবে হ্যাঁ শহরটা বড় মজার। দিল্লিতে এক ব্যাঙ্কে কাজ করেছি কিছুদিন। ভাল লাগেনি। এখানে কেউ যেমন কারও দিকে তাকায় না, তেমনি কেউ কাউকে কোন কিছুতে বাধাও দেয় না। সবাই যে যার মত মনের খুশীতে চলছে। এমন সহনশীলতা আর কোন শহরে আছে বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া এত ভিড় আর হট্টগোলের মাঝখানে আনন্দের উপকরণও কম নয়।"

লক্ষ্মণ রাও থামতেই জিজ্ঞেস করলাম, "বাঙালীদের কেমন লাগে?"

তিনি মৃদু হাসলেন। বললেন, "রাগ করবেন না। আমি বাঙালীদের সম্পর্কে কিছুটা হতাশ হয়েছি। যখন দেশে ছিলাম, ভাবতাম আপনারা বুঝি খুব মিশুকে। এখানে এসে দেখছি, মোটেই তা নয়। আপনারা যেন নিজেদের নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন, ভিন্ন রাজ্যের লোকেদের ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। এই তো দেখুন, একটু বাংলা শেখার জন্যে আমার এক বাঙালী সহকর্মীকে কতদিন থেকে বলছি, ভদ্রলোক গা-ই করলেন না।

আর একজনকে বলছিলাম, তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যেতে। একটি মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছে ছিল। এই ভদ্রলোক 'আজ না কাল' করতে করতে পুরো এক বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। আমিও কোন বাঙালীকে আর কোন অনুরোধ করি না। কী দরকার, বেশ আছি।"

যাবার আগে লক্ষ্মণ রাও হাতজোড় করে বললেন—'নোমস্কার।' প্রত্যেক অবাঙালীই কলকাতায় এসে ঐ শব্দটি প্রথম শেখে।



মাফিয়াম্বা

অমাবস্যার অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিলিক। মেডিকেল কলেজের নিগ্রো-ছাত্র মাফিয়াম্বা সাদা দাঁতের হাসি ছড়িয়ে বললে, "ক্যালকাটা ইজ এ গ্রেট সিটি, কলকাতাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

পিটার চার্লস মাফিয়াম্বার দেশ পশ্চিম আফ্রিকায় ক্যামেরুনে। সে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ডাক্তারী পড়তে এসেছে ভারতবর্ষে। মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ঘুরে কলকাতায়। এম-বি-বি-এস পরীক্ষা দিয়ে তৈরী হচ্ছে পি-আর-সি-এ পরীক্ষায়।

মাফিম্বার বয়স তিরিশ। একহারা মাঝারি গড়ন। চোখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য, মুখে সারল্যের হাসি। ডোরাকাটা রঙীন বুশ সার্ট আর খয়েরী রঙের ফুল প্যাণ্ট পরে সেদিন সে আমার সঙ্গে আলাপ করছিল নানান বিষয়ে।

বললে, "এদেশ এসেছি ১৯৫৩ সালে। প্রথমে ছিলাম মাদ্রাজ। সেখান থেকে আই-এস-সি পাশ করে ডাক্তারী পড়তে যাই লক্ষ্ণৌ। বেশিদিন ভাল লাগল না। বছর দেড়েক কোনমতে কাটিয়ে চলে এসেছি কলকাতায়, ভর্তি হয়েছি মেডিকেল কলেজে। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে। তারপর বরাবর এখানে। আর এবারে তো দেশে ফেরার সময় হল। আসছে বছর মার্চ মাস নাগাদ রওনা হব ক্যামেরুন। ঈস, কতদিন ঘর ছাড়া।"—

জিগগেস করলাম, "কেমন লাগে এই শহর?" জবাবে মাফিয়াম্বা বললে—' দেখুন, বড় কঠিন প্রশ্ন। কতটুকুই বা দেখেছি কলকাতার। চট-পট বলা মুশকিল। তবে হ্যাঁ, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ আর কলকাতার সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারি, মাদ্রাজ হচ্ছে ফ্রেণ্ডলি সিটি, লক্ষ্ণৌ নাইস বাট স্মল সিটি। আর কলকাতা? এ ভেরি বিগ অ্যাণ্ড লাইভলি সিটি। এ শহরে প্রাণচাঞ্চল্য অনবরত টগবগ করে ফুটছে। অতিকায় জায়গা তো, তাই বাইরের লোকের উপস্থিতি সম্পর্কে সে নিস্পৃহ। কে এল, কে গেল, তার খোঁজ নেই। তেমনি অতিকায় বলেই এখানে ক্ষুদ্রতা তেমন নেই। আমার দেশ ক্যামেরুনের জনসংখ্যাই এই একটিমাত্র শহরের জনসংখ্যার সমান। আমি তো এখানে এসে থই পাইনা। এত হৈ-চৈ, লোকজন, বাড়ি-ঘরের গাদাগাদি—বাপরে, মাথা ঘুরে যায়। তবে হাঁ, এখানকার ছাত্র অধ্যাপক সবাই সহৃদয়।"

মাফিয়াম্বা খানিক দম নিয়ে আবার সুরু করল—"আর একটা কথা বলি, এখানকার লোকেদের দেখেছি বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ ও জ্ঞান দারুন। ভারতের অন্য কোথাও যেটা নজরে পড়েনি। তাছাড়া আফ্রিকা সম্পর্কে আগ্রহ কলকাতা শহরের মত আর কোথাও নেই।"

"এখানে কজন আফ্রিকান ছাত্র রয়েছে?"—

"জনা আঠারো। তারমধ্যে বেশীর ভাগই ডাক্তারী পড়তে এসেছে। দু'একজন অর্থনীতির ছাত্র, কয়েকজন রেলওয়ের কাজ শিখছে। ক্যামেরুনের লোক আমি ছাড়া আরও দু'জন। একজন স্কটিশ চার্চ থেকে আই-এস-সি পাশ করে মেডিকেল কলেজে সবে ঢুকেছে, আর একজন দাঁতের চিকিৎসা শিখছে।"

মাফিয়াম্বা থাকে অন্যান্য বাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে। এখানকার খাবার কেমন লাগে জিগগেস করতেই বললে—"প্রথম প্রথম অসুবিধে হত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। তবে অন্যান্য আফ্রিকান ছাত্রের সঙ্গে মিলে মাঝে মাঝে দেশী রান্না বানিয়ে খাই।"

মাফিয়াম্বার তখন কথা বলার নেশায় পেয়েছে। আমার প্রশ্নের অপেক্ষা না করেই কথা বলে চলল। "ভারতের অনেক জায়গা ঘুরেছি। দার্জিলিং, যোধপুর, উদয়পুর, জয়পুর, মাণ্ডু, সেবাগ্রাম, উতকামণ্ড, বোম্বাই, দিল্লি বহু জায়গা। সৌন্দর্যের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল লেগেছে ব্যাঙ্গালোর আর ইতিহাসের দিক থেকে রাজস্থান। দেখে মুগ্ধ হতে হয়। সব রাজ্য ঘোরা হয়ে গেছে, বাকি শুধু আসাম, যাওয়াও হবে না। যা গোলমাল সেখানে। এখন আর কোথাও যাব না। মন চলে গিয়েছে দেশের বাড়িতে।"—

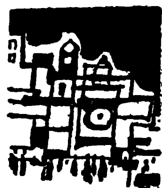
"কে কে আছে বাড়িতে? মা, বাবা, ভাইবোন?"

"ভাইবোন নেই। আমি একমাত্র ছেলে। মা আছেন। বাবা মারা গেছেন ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। আমি তখন এখানে"—

মনে হল, মাফিয়াম্বার গলাটা তখন ধরা-ধরা। খানিক থেমে কিছুটা অন্যমনস্কভাবেই বলল,—"দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফেরার কয়েক মাস বাকী, কিন্তু গিয়ে বাবাকে তো আর পাব না। তাঁকে শেষ সময়ে দেখতে না পারার দুঃখ আমার কোনদিন যাবে না। —আচ্ছা চলি, রাত অনেকটা হল।"

"দেশে ফেরার পর আবার কোনদিন আসবে তো ভারতে ?"

"নিশ্চয়,"—মাফিয়াম্বা প্রত্যয়ের সুরে বলে—"কেন আসব না, আপনাদের এই শহরকে ভালবেসে ফেলেছি যে। আবার আসব, আবার দেখা হবে।"



অচেনা শড়ক

প্রবাসী বন্ধুটি দীর্ঘ বার বছর পর কলকাতায় ফিরেছেন। বললেন, "আর বলো না ভাই, মহা মুশকিলে পড়েছি। রাস্তা-ঘাটে চলাই দায়। রাসবিহারী এভিন্যুতে ট্যাক্সি নিয়েছি। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় যাব। ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কথা শুনে মনে হল, অপরিচিত বিদেশে এসেছি। ড্রাইভার বললে, 'কোন্ দিকে দিয়ে যাবেন ? শরৎ বসু রোড দিয়ে ?' আমি আকাশ থেকে পড়ি। এ আবার কোন্ রাস্তা, আগে তো নাম শুনিনি। অজ্ঞতা ঢাকার জন্যে বলি ; 'তাই চলুন, কিন্তু এ পথে কি সোজা হবে ?'

"ড্রাইভার তারপর যা বলল, শুনে আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। বললে, 'কেন হবে না, শরৎ বসু রোড দিয়ে বেরিয়ে বাঁয়ে বাঁক ঘুরে রফি আমেদ কিদোয়াই রোড ধরে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীটে পড়ব, সুবোধ মল্লিক উদ্যান ডাইনে রেখে সোজা বিপিনবিহারী

গাঙ্গুলী স্ট্রীট, তারপরেই সূর্য সেন স্ট্রীট, মহাত্মা গান্ধী রোড। ব্যস কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় এসে গেলেন।'

"আমার সব গুলিয়ে গেল। কস্মিন্‌কালে ওসব নাম শুনিনি। মাত্র বার বছরের ব্যবধানে গোটা কলকাতা আমার কাছে অচেনা হয়ে গেল? এসব কোন রাস্তাই তো আমি চিনিনে। সম্বিৎ ফিরল খানিক পরেই। পুরনো রাস্তার নাম পালটে এ কী চেহারা হয়েছে শহরটার! আরও কয় বছর পরে এলে হয়ত গোটা কলকাতাই আমার কাছে বিদেশ হয়ে যেত।"

বন্ধুটির কাছে জানতে চেয়েছিলাম এই বার বছরে কলকাতার চেহারার কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। তার উত্তরেই ঐ বিলাপোক্তি। অভ্যস্ত চোখে দেখে দেখে যে পরিবর্তন আমাদের নজর এড়ায়, তাই ধরা পড়ে হঠাৎ-ফিরে-আসা প্রবাসীর চোখে। বন্ধু আবার শুরু করলেন:

"ঐ তো বললুম, রাস্তাঘাটের নাম পরিবর্তনের কথা। মহা গোলমেলে ব্যাপার। অন্য পরিবর্তনের মধ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে ঝক্‌ঝকে স্টেটবাসের মিছিল। একতালা, দোতলা। নূতন বাস-গুলো শহরের চেহারাই পালটে দিয়েছে। ভিড় বেড়েছে, ট্যাক্সির সংখ্যা বেড়েছে। এবং মনে হয় শহরবাসীর হাতে পয়সাও বেড়েছে। নইলে ট্যাক্সি পাওয়া দায় হবে কেন? যাত্রী উপেক্ষা করে ট্যাক্সি চলে যাওয়ার নজীর কলকাতা ছাড়া আর কোথাও নেই। তাছাড়া বার বছর আগেকার কলকাতা যে-কে-সেই। পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের ঘোড়ায়-চড়া উদ্ধতভঙ্গী আউটরামের মূর্তির বদলে গান্ধীজীর মূর্তিও নূতন জিনিস। হ্যাঁ, আর একটা জিনিস নজরে পড়ল। সে হচ্ছে ওষুধের দোকান। ভারতের এত জায়গা ঘুরেছি। উত্তর-ভারত, দক্ষিণ-ভারত, কোথাও বাদ যায়নি, কিন্তু এত ফার্মেসী দেখিনি। বাইরে থেকে শুনেছিলুম, এখানে নাকি

ব্যাঙের ছাতার মত চীনে লণ্ড্রীর দোকান গজাচ্ছে। এসে দেখছি চীনে লণ্ড্রীর সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছে কেমিস্টস অ্যাণ্ড ড্রাগিস্টস এবং 'অমুক ফার্মেসী' মার্কা সাইনবোর্ডের সারি।"

দুজনে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছিলাম। চেয়ে দেখি, কী সর্বনাশ বন্ধুটির কথাটা তো ফ্যালনা নয়! সত্যিই তো দু পা যেতে না যেতেই যে ওষুধের দোকান! বাসে চড়ে যে যে রাস্তা পার হলাম, তার দু'পাশেও একই ব্যাপার। যে-পাড়ায় থাকি, তার কথা মনে করে আঁতকে উঠি। গত সাত-আট মাসে সে পাড়াতেও পাঁচ-ছটি ওষুধের দোকান নূতন খুলেছে। এতদিন তো খেয়াল করিনি।

বন্ধু বললে,—"আর তোমাদের কলকাতায় আসছিনে! যে রেটে তোমাদের রাস্তাঘাটের নাম পাল্টাচ্ছে আর ওষুধের দোকান বাড়ছে, তাতে বছর পনর পর এলে রাস্তায় বেরোনো চলবে না, পদে পদে বোকা বনব। আর তখন হয়ত মাছ-ভাতের বদলে কেবল ওষুধ খেয়েই থাকতে হবে।"

বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণীতে আমিও আঁতকে উঠেছি। মাছ-ভাতের আকাল তো শুরু হয়ে গেছে।



বীট কবি বদরু

প্রিন্সেপ সাহেব ব্রাহ্মী লিপির উদ্ধার করে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের চেহারা পালটে দিয়েছিলেন, এখন তাঁর নামাংকিত গঙ্গাঘাটের বিরাট চত্বর অসংখ্য পাপীতাপী আর ভবঘুরে উদ্ধার করছে।

রোমান ফোরামের কায়দায় তৈরী প্রিন্সেপ ঘাট ফটকের তলা হরেক রকম লোকের আশ্রয়। ভিখিরি, পাগল, চোর, বদমাস সবাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সেখানে পড়ে থাকে। কেউ কাঁথা বিছিয়ে, কেউ চিংড়ি-কুঁকড়ি মেরে। রাতের অন্ধকার নামলে কারও চোখে আগুন ছোটে, ইস্পাতের ফলার মত কারও নখ নিসপিস করে।

খানিকটা ঝোপঝাড়, মাঝিমাল্লার ভিড় আর দূরদেশী জাহাজের চীৎকার। একধারে গঙ্গা, অন্যধারে ময়দান। সামনে চলে গেছে লম্বা রাস্তা—খিদিরপুর হেস্টিংসের দিকে। সেদিন বাস থেকে হঠাৎ নেমে পড়লাম প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে। এবং সেখানেই লোকটির সঙ্গে আলাপ।

নাম বদরু। হিন্দু না মুসলমান—নিজেই ঠিক জানে না। বদরুদ্দিনও হতে পারে, বদরিপ্রসাদ হতেও বাধা নেই। আদি নিবাস? না, তাও জানা নেই। আপাতত আস্তানা শহর কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাট। বয়স একুশ-বাইশ। পরনে ছেঁড়া

হাফপ্যাণ্ট এবং নোংরা হাতকাটা গেঞ্জি। একটা থামে হেলান দিয়ে আপন মনে বিড়বিড় করছে দেখে কৌতূহল হল। হাতে আবার খাতা পেনসিল।

খানিক ঘুরঘুর করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম,—"কী লিখছ?" আমার দিকে চোখ না তুলেই সে বললে—"পোয়েট্রি"। আমি আকাশ থেকে পড়ি। সর্বনাশ, কোন "বীট-কবি" নাকি!

আলাপচারী হতেই বদরু বললেঃ পেশা বলে তার ধরাবাঁধা কিচ্ছু নেই। কখনও ভিক্ষে, কখনও দিনমজুরী। রোজ আনে, রোজ খায়। কোনদিন তাও জোটে না। গত দু-বছর এখানেই রাত কাটাচ্ছে! আগে ছিল খিদিরপুর পুলের তলায়। তার আগে? ঠিক মনে নেই, মেটেবুরুজের দিকে কোথায় যেন। এ আস্তানাও ছাড়বে শীগগির।

আমার নজর তার খাতার দিকে। দেখতে চাইলাম। এবং পাতা উল্টে দেখি, কী আশ্চর্য, আঁকাবাঁকা বাংলা হরফে একের পর এক গোটা বারো কবিতা! এলোমেলো কাটাকুটি, অদ্ভুত অদ্ভুত কথা, মিল নেই, মাথামুণ্ডুও নেই।

ছোকরা লেখাপড়া শিখল কোত্থেকে? জানালেঃ লেখাপড়া কিছুই জানে না, ছোট-বেলা মা বাংলা হরফ শিখিয়ে দিয়েছিল। মা কোথায়?—"ঠিক জানি না, বোধ হয় মরেটরে গেছে"—বদরুর নিস্পৃহ জবাব।

অচেনা শহরের পাঠককে বদরুর খাতা থেকে টুকে আনা একটি কবিতা উপহার দিই। অর্থোদ্ধারের ভারও আপনাদের হাতে।

লাল লাল কাগজের পাতা লাল লাল
লাল লাল জল মাথায় দাও লাল

আমি জল খাব আমি জল খাব
লাল লাল লাল

অন্য কবিতাগুলোও ঐ রকমের ননসেন্স ছড়ার ব্যাপারে সুকুমার রায়কে হার মানিয়েছে। বীট কবিরা তো পাত্তাই পাবে না। তবে এত 'লাল লাল' কেন?

রাজনীতি-বিশারদরা এ বিষয়ে কী বলেন? আর আধুনিক বাংলা কবিতার শল্য চিকিৎসকরা?



হরিশরাম

কলকাতার মত আর কোন শহরে এত ফুটপাত-শিল্পী আছে বলে আমার জানা নেই। পথে বেরোলেই আপনার নজরে পড়বে, কোথাও না কোথাও একজন আধ-পাগলা লোক কাঠকয়লা আর চকখড়ি দিয়ে ফুটপাত চিত্রবিচিত্র করে চলেছে। চারদিকে লোকজনের ভিড়, পথচারী অন্যরা একবার উঁকি মেরে পাশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে আর মাঝখানে সর্বদৃষ্টির মধ্যমণি হয়ে সেই নাম-না-জানা শিল্পী আপন-মনে এঁকে চলেছে রাম, সীতা, হনুমান, মহাদেব। কিংবা অন্য কোন দেবদেবীর অতিকায় প্রতিকৃতি। সাদা আর কালো রঙের সঙ্গে কখনও কখনও মেশে হলুদের গুঁড়ো, গোলাপী খড়ি।

এই শিল্পীদের চেহারাও দেখবার মত। প্রায়ই খালি গা, অধোবাস টুটাফাটা এবং মাথার চুল উসকোখুসকো। দেখে মনে হবে পাগল, এবং তাদের দু'একজন হয়ত তাই। কিন্তু এমন কয়েকজনের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছি, যাদের কিছুতেই খ্যাপা বলা চলে না। বরং দেখা গেছে, কথায় বার্তায় বেশ বাহাদুর।

হরিশরামের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের ফুটপাতে। সেদিন লোকজনের বেশি ভিড় নেই। গন্ধমাদন পাহাড় হাতে হনুমানের এক ছ-ফুটী ছবির পাশে সে তখন বিড়ি ফুঁকছিল। বললুম, "কে শিখিয়েছে তোমাকে ছবি আঁকা?"

হরিশরাম কোন জবাব দিল না। মুখের আধপোড়া বিড়িটা কাছের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। আমি নাম জানতে চাইলুম।

নাম বলল। এবং আরও বলল, তার বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায়! কলকাতায় আছে আজ "চওবিস বরষ।" এখন তার বয়স চল্লিশ।

"কিন্তু এমন সুন্দর ছবি আঁকার হাত হল কোত্থেকে?"

হরিশরাম একগাল হেসে বলল, "কারো কাছেই শিখিনি, না জানি কেমন করে হাত এসে গেছে।"

"পেট চলে কী করে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে—"দু'চারজন ছবির উপর পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে চলে যায়। কোনদিন খাবার জোটে, কোনদিন জোটে না।"

"কাজ করলেই তো পার?"

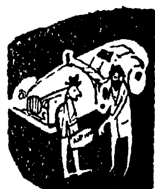
হরিশরাম এবারে শুধু বিজ্ঞের হাসি হাসল। কোন জবাব না দিয়ে আর একটা বিড়ি ধরাল। খানিক গুম মেরে বসে বললে,—"বাবুজী, এইখানেই তো মুশকিল, কাজ যদি করতেই পারব,

তাহলে এমন দিওয়ানা হয়ে বসে আছি কেন? কাজতো আগে করতামই, কিন্তু কোলের বাচ্চা নিয়ে বউটা যে মরে গেল হঠাৎ।"

হরিশরাম কাঠকয়লা নিয়ে হনুমানের পাশেই ছবি আঁকতে আবার বসে গেল। মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল রাম-সীতা।

বিদায় নেবার আগে মনে হল, এই সীতার সঙ্গে বালিয়া জেলার কোন একটি গাঁয়ের কোন মেয়ের মুখের আদল হয়ত থাকতে পারে।

হরিশরামকে সেকথা আর জিগগেস করিনি।



রক্তের বদলে

রাত সাড়ে তিনটায় মেডিকেল কলেজের সদর ফটকে যখন ট্যাক্সি ঢুকল, দেখি, বড় বাড়িটার দেয়াল ঘেঁসে যাট-সত্তর জন লোক উবু হয়ে বসে আছে। পরনে ছিন্ন বাস, চুল উসকো-খুসকো, অধীর আগ্রহে কীসের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে।

এরা কারা? জরুরী প্রয়োজনে ব্লাড ব্যাঙ্কের ঘরে ঢুকতে গিয়ে ভাবি।

বোধহয় এরা হাসপাতালেরই ওয়ার্ড বয় বা ঐ ধরণের অন্য কেউ। কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্যে সময় গুণছে।

ভোর ছটায় আবার ব্লাড ব্যাঙ্কের দোর গোড়ায়। আবার রক্তের প্রয়োজন। সময়ের সঙ্গে এবং মৃত্যুর সঙ্গে আবার লড়াই। সুখলাল কারনানি হাসপাতালের নির্দেশ নিয়ে ট্যাক্সি মেডিকেল কলেজে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়েছে।

এখানে এত ভিড় কেন? উবু হয়ে বসে থাকা ষাট-সত্তর জনের সেই লাইন হঠাৎ কেন এমন বাজারের রূপ নিল?

এরা তাহলে ওয়ার্ড বয় নয়। তাহলে কি হাসপাতালের অধস্তন কর্মচারীদের বেতন-দিবস আজ? মাইনে নিতে জড় হয়েছে? নাকি বিক্ষোভ মিছিল?

ব্লাড ব্যাঙ্কের ডাক্তারবাবুটিকে জিগগেস করতেই বললেন,—"এরা রক্ত দিতে এসেছে, প্রতিদিন এই রকম আসে। কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আপনারা তো শুধু নিতেই জানেন, দেবার বেলায় ওরাই সংখ্যায় বেশি।"

কাউন্টার থেকে মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকালাম। দেখি, অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—দিন-মজুর, ঠেলাওলা, ভিখিরি এবং গরীব-দুঃখীর দল। মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে তিল তিল করে জমানো তাজা রক্ত দিতে ওরা এসেছে। এদেরই এই সঞ্চয় বোতলে ভর্তি হবে, লেবেল পড়বে, মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর শয্যার পাশে ছুটে চলবে।

খবর নিয়ে জানলাম, রক্ত দেবার জন্যে প্রতিদিন এই রকম মারামারি লেগে যায়। তিন মাসের মধ্যে দু'বার দেবার নিয়ম নেই; তবু আইন ফাঁকি দিয়ে, নাম ভাঁড়িয়ে ওদের অনেকে বারবার আসে ঝকঝকে দশ টাকার নোটের লোভে। বাড়তি পাওয়া যায়, ডিম, দুধ, ফল। তাই বা মন্দ কী।

কোটরাগত-চোখ এক মাঝ-বয়সীকে জিগগেস করতেই জবাব

দিল,—"বাবু, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। একদিনে পুরো দশটি টাকা রোজগার গতরে খেটে তো করতে কোনদিন পারব না। যখনই টানাটানি পড়ে এখানে তাই চলে আসি।"

"স্বাস্থ্যের কথা ভাবো না?"

"আর স্বাস্থ্য,"—ম্লান হেসে লোকটি বলল—"কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে উপোস থাকার চেয়ে এই ঢের ভাল।" একটু থেমে আবার বলল, —"আর পাশের এই রোগা লোকটিকে দেখছেন তো; বছর দুই আগে কী জোয়ান ছিল। এখানেই প্রথম আলাপ, দেখতে দেখতে লোকটা কেমন মিইয়ে গেল।"

আমার হাতে তখন তিনশ সি-সির দু'বোতল তাজা রক্ত। টগবগ করছে। অসংখ্য কোটরগত চোখ লোলুপ দৃষ্টিতে আমার দিকে, আমার হাতের বোতলের দিকে তাকিয়ে আছে।

সেই মুহূর্তে মনে হল, আমি যেন এদেরই কারও কাছ থেকে কিছু চুরি করে ফেলেছি। এখানে এই ভিড়ের মাঝখানে রক্ত-লোলুপ আমার দাঁড়াবার কোন অধিকার নেই।

লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে এলাম।



পুজো আসছে

ভাদ্র যায়-যায়, আশ্বিন এলো বলে। এদিকে কলকাতায় এখনও ছুটির বাঁশি বাজেনি। নীলের বদলে আকাশের মুখে কালির ঘন পোঁচ। রকম সকম দেখে মনে হয়, খ্যাপা শ্রাবণ ভাদ্রের চৌকাঠ পেরিয়ে আশ্বিনের আঙিনায় ছুটে যেতে তৈরী।

গত ক'দিন ধরেই চলছে বৃষ্টি। শ্যামবাজারের ছাদে বৃষ্টি, মাণিকতলার খালে বৃষ্টি, মনুমেন্টের গায়ে বৃষ্টি। কখনও ফণা উঁচিয়ে আসে, কখনও আসে বর্শা বাগিয়ে। তারপরেই রুদ্র-নাচের মাতন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে চলে ঝমর ঝমর পায়ের নূপুর। সেই মাতনে ওপারের বাড়িঘর গাছপালা যেমন ঝাপসা, তেমনি ঝাপসা এপারে চৌরঙ্গীর মাথায় জ্বালা একশ মাণিকের মালা। স্তম্ভিত শরৎ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে। এই আসরে যেন তার প্রবেশ নিষেধ।

তা হোক, দেয়ালপঞ্জীর কিন্তু তর সইছে না। জোর কদমে এগিয়ে চলেছে এক সারি লাল তারিখের দিকে। দোকানের লাল শালুতে, গলির মোড়ের লাল শালুতে শোনা যাচ্ছে তারই আগমনী। কলকাতায় পুজো আসছে।

আগমনী গান এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে দোকানে

দোকানে। শরৎকাল এলেই যেমন শিউলি ফুলের গন্ধ গ্রামের মন মাতায়, তেমনি ঐ সময় নতুন কাপড়ের কোরা-কোরা গন্ধে শহুরে বাঙালীর মন কেমন করে। আর জামাকাপড়ের দোকানে ক্রমবর্ধমান ভিড় জানিয়ে দেয় পুজোর আর দেরি নেই।

দোকান তো নয়, সাক্ষাৎ 'শতভূজা।' অষ্টপ্রহর এগিয়ে দিচ্ছে রঙবেরঙের শাড়ি। ঢাকাই, শান্তিপুরী, মাদ্রাজী, কটকী, নাইলন, কাঞ্জিভরম, কত কী! "—এদিকে দেখি ঢাকাই বেনারসী এক-জোড়া," "হ্যাঁ হ্যাঁ এগারো-পঞ্চাশ,"—"ও মশাই, চলে যাচ্ছেন কেন," "ঠিক আছে, ঠিক আছে, সাড়ে সতেরোই দেবেন"——"সে কি বলেন দাদা, পঁচাশি? তার চেয়ে—"—"ও-রে—মে মো।" বিচিত্র কথার কলরব কলকাতার প্রত্যেকটি কাপড়ের দোকানে।

ধর্মতলায়, কলেজ স্ট্রীটে, কালিঘাটে, শেয়ালদায়, দেশপ্রিয় পার্কের কিনারে, সব জায়গায় ভিড়। মধ্যবিত্ত গরিবের আনাগোনা ফুটপাতের দোকানে, কাটারায়। গাড়ি হাঁকিয়ে প্রজাপতির রঙ বুলিয়ে যাঁরা আসেন, তাঁদের গতি খানদানী দোকানে। অক্লেশে গুণে দেন, সাতশো আটশো টাকার বিল। গায়ে লাগে না।

এদিকে লক্ষ্মী কাটারা, গণেশ কাটারা জাতীয় দোকানে যেন কুম্ভমেলা লেগে গেছে। ঐ সব কাটারার খোপে খোপে নাকি বসে থাকেন 'গলা কাটারা।' দাম শুনলেই চক্ষু চড়ক গাছ। লোক বুঝে দামের কোপ। দর কষাকষির হিম্মত যার যত বেশি, সে-ই বেরিয়ে আসতে পারে ঐ সকল 'অভিমন্যু ব্যূহ' থেকে। "এদিকে আসুন দিদি," "ও-দাদা কী চাই আপনার?" "আহা-হা একটিবার চেয়েই দেখুন না"—সপ্তরথীর দল ঢুকতে না ঢুকতেই ছেঁকে ধরে। তার ভেতর থেকে দাম দর কমিয়ে, না ঠকে পছন্দসই জিনিস কিনে বেরিয়ে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। ছোট ছেলে বা

মেয়ের হাত ধরে আসেন গিন্নী, পেছনে গোবেচারী কর্তা। জমা হয় কাপড়ের রাশ। এটা দেখি ওটা দেখি বলনেওয়ালী খুঁৎখুঁতে খদ্দেরের বায়না মেটাতে মেটাতে দোকানী নাজেহাল। এ দোকান থেকে ও দোকান। বাছাইয়ের পর বাছাই। নাছোড়বান্দা দোকানীকে নাকানিচোবানি খাইয়ে ক্যাশমেমো যখন আসে, কর্তার মাথায় বজ্রাঘাত। চিরতার জল খাওয়ার মত মুখ করে বেশ কয়েক খানা নোট গুণে দেন।

এ সময় কাপড়ের দোকানগুলো দেখে,—আহা, চোখ জুড়োয়, কী রঙের বাহার, কী পাড়ের জলুস! বেশিরভাগই মেয়েদের জিনিস। মিলের চেয়ে তাঁতের দিকেই নজর বেশি। প্রতি বছর নতুন ফ্যাশান, নতুন নাম। মেয়েদের মনের মত তাদের রুচিও যখন তখন পালটায়। আর তুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীদের সাধ মিটিয়ে মিটিয়ে এ যুগের ভোলানাথের দল দিগম্বর না হলেও কৌপীনধারী।

তবু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় এ সময় পথ চলা দায়। তু' পা যেতে না যেতেই দেখা যায়, ফুটপাতের দোকানে বার টাকার মিলের শাড়ি নিয়ে দর কষাকষি করছেন গরিব গেরস্থ, চোখ ঝলসানো দোকান থেকে হাসিখুশীতে উজ্জ্বল বেরিয়ে আসছে ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে। হাতে রঙীন শাড়ি ঠাসা গাদাগাদা বাক্স।

ঐ শাড়ি গরিব গেরস্থকেও ডাকে। কিন্তু তাদের সাধ আর সাধ্যে যে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক! অগত্যা মিলের শাড়ি। স্ত্রীর জন্যে। মায়ের জন্যে। আইবুড়ো মেয়ে তুটোর জন্যে। আর হ্যাঁ, খোকার জন্যে নীল প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, লাল জুতো নিজের জন্যে কিছু না নিয়ে গেলে গিন্নী আবার রাগ করবেন। কী নিই? পকেট তো খালি। ঠিক আছে, একটা গেঞ্জিই সই। অনেকদিনই

থেকে গায়ের গেঞ্জি নেই। বছরে তো এই একটি পরব! ছেলেমেয়েরা পথ চেয়ে বসে আছে। গরিব বলে কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই। ছাপোষা কেরানীর মুখে ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশের মত নির্মল তৃপ্তির হাসি। পুজোর আর দেরি নেই।



বাঙালীর ব্যবসা

দুপুর বেলার ফাঁকা ট্রাম। ভদ্রলোক আপশোস্ শুরু করলেন, বাঙালীর ব্যবসা নিয়ে। সেই চিরন্তন কথা,—গেল, গেল, সব গেল।

পার্শ্ববর্তীকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন—"সবই তো গেছে, বাকি ছিল গয়নার আর মিষ্টির কারবার। তার মধ্যে মিষ্টিও বুঝি আর আমাদের হাতে রইল না। বাঙলা দেশের রসগোল্লা খানদানী জিনিস, বিদেশে পর্যন্ত যায় চালান। আর মণ্ডা-মিঠাই খানেওয়ালা-দের জিব তো রসগোল্লা দেখলেই লকলক করে। সেই রসগোল্লা কিনতে হলে কিনা কলকাতার লোক আজকাল যায় অ-বাঙালী মিষ্টির দোকানে। বিদেশ থেকে হোমরাচোমরা অতিথি এলেও ডাক পড়ে সেই অ-বাঙালী দোকানের। তাঁরা লম্বা লম্বা সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে যান। আর বাঙালী মিষ্টির দোকান? আছে। তবে একটি দুটি ছাড়া কোনক্রমে নামমাত্রই আছে।

অনেক নামকরা দোকান তো উঠেই গেছে। আপশোস্ কি সাধে করছি মশাই।"

ভদ্রলোকের আপশোস্ যে অকারণ নয়, তা আমিও মনে-মনে স্বীকার করেছি। অ-বাঙালী মিষ্টির দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধি আমারও নজরে পড়েছে। তার জন্যে অন্যকে দায়ী না করে দোষটা আমাদের নিজেদের ঘাড়ে নেওয়া উচিত। আধুনিক রুচি আর নতুন নতুন চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পারলে পতন অনিবার্য। শুধু মিষ্টি কেন, কলকাতার হোটেল-রেস্টুরেণ্টের ব্যবসাতে বাঙালীদের পিছু-হটার অন্যতম প্রধান কারণ বোধহয় সেটাই। দূরদর্শী ব্যবসা-বুদ্ধির অভাব তো আছেই।

এই প্রসঙ্গে অগ্নিযুগের বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত এবং উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নামে চালু এক গল্প মনে পড়ছে।

উল্লাসকর এবং উপেন্দ্রনাথ—দুই বন্ধু মুক্তি পেয়েছেন দীর্ঘ দিনের কারবাস থেকে। কলকাতায় এসে তাঁরা ঠিক করলেন, চাকরি-বাকরি নয়—ব্যবসাতে হাত দেবেন। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, আর ব্যবসা যদি করতেই হয়, তবে বাঙালীর জাতীয় সম্পদ রসগোল্লার। কলকাতায় তাঁরা রসগোল্লার দোকান দেবেন।

যেমন কথা, তেমন কাজ। দোকান চালু হয়ে গেল। গোড়া থেকেই দুই দোকানদার সাবধানী। ধারে কোন জিনিস বিক্রী করবেন না। ঐটেই নাকি ব্যবসায়ে বাঙালীর পতনের কারণ। শুধু খদ্দের নয়, নিজেরাও যদি রসগোল্লা খান, তবে নগদ পয়সা দিয়ে খেতে হবে।

উপেন ব্যানার্জি বললেন—"দেখ ভাই উল্লাসকর, আমার যদি রসগোল্লা খাবার ইচ্ছে হয়, তাহলে তোমাকে নগদ দাম দু আনা দিয়ে একটি রসগোল্লা খাব। আর তোমার যদি খাবার ইচ্ছে হয়,

তাহলে আমার হাতে নগদ দু'আনা দিয়ে তুমি একটি খাবে। বাকী কারবার কখনই নয়।"

উল্লাসকর বললেন—তথাস্তু।

সামনে থরেথরে রসগোল্লা সাজানো। রসে রসে টইটম্বুর। পেছনে বসে আছেন দুই বিপ্লবী দোকানদার। খানিক পরেই উল্লাসকরের রসগোল্লা খাবার ইচ্ছে হল। তিনি পূর্বের শর্ত-মত নগদ দু' আনা উপেন ব্যানার্জির হাতে দিয়ে একটি রসগোল্লা খেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ যায়। এবারে উপেন ব্যানার্জির সখ হল রসগোল্লা খাবার। তিনি সেই দু' আনা উল্লাসকরের হাতে গুঁজে দিয়ে একটি পেটে পুরলেন।

দুটি রসগোল্লা চেখে দুজনের সর্বনাশ। এমন সরস জিনিস কি একটি খেয়ে হয়! তবে হ্যাঁ, নিজের দোকান হলে কী হবে, নগদ দামে খাওয়া চাই। দুই বন্ধু পালাক্রমে একটির পর একটি রসগোল্লা খেয়ে যেতে লাগলেন এবং একই চৌকো দু'আনি এ হাত ও-হাত ঘুরতে লাগল মাকুর মত। ঘণ্টা চারেক পরে দেখা যায়, দোকানের সব রসগোল্লা সাবাড়, আর ক্যাশবাক্সে পড়ে আছে "নগদ দামের" সেই আদি ও অকৃত্রিম সবেধন নিকেলমণি দু'আনি। একজন আর একজনের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকান। এবং পরদিনই লালবাতি।

গল্পটি কতদূর সত্যি ঠিক জানিনে, তবে এই হচ্ছে গিয়ে বাঙালী ব্যবসার টিপিক্যাল উদাহরণ।



ঝাঁপির আড়ালে

কী সুখে বেঁচে আছেন কলকাতায়?—

এখানে পাবেন না মাথা গোঁজার বাড়ি, চলাফেরার ট্যাক্সি, ট্রামে-বাসে আসন, সিনেমা-ফুটবল-ক্রিকেটের টিকিট, হাসপাতাল-ইস্কুল-কলেজে সীট, হোটেল-রেস্তোরাঁয় জায়গা—না বলতে কিছুই পাবেন না। হাতের কাছেই সব, কিন্তু পাবার জো নেই। যেন ভোজবাজি। আর সেই ভোজবাজির গোলকধাঁধায় পা ফেলে আমরা সবাই চরকি-পাক খেয়ে মরছি। পালাবার পথ নেই, পিছু হটবার পথ নেই, শহর আমাদের বেঁধে রেখেছে আষ্টে-পৃষ্ঠে।

এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে আলোর ভাগ যত, অন্ধকারের ভাগ অনেক বেশি। আলিপুর রোড আর ক্যামাক ষ্ট্রীটের দেড় একরী বাড়ির চেয়ে ট্যাংরা-মাণিকতলার দেড় ফুটী খুপরি সংখ্যায় বেশি। দেড় একরীর জন্যে সব আছে,—বাড়িগাড়ি, দোকানপাট, বাঘের চোখ, গাধার দুধ, ঘোড়ার ডিম সব কিছু। দেড়ফুটিদের জন্য নেই বলতে কিছুই নেই।

টলস্টয় জানতে চেয়েছিলেন, একজন মানুষের কতখানি জমি দরকার। তাঁর মতে ছ'ফুটেই নাকি চলে। কিন্তু শহর কলকাতায় এলে তিনি দেখতে পেতেন, ছ'ফুটে একজন নয়, গোটা পরিবারেরই

চলে। দু'ফুটি ঘর আবার বহুরূপী। কখনও কিচেন, কখনও ড্রয়িংরুম, কখনও স্টাডি, কখনও বেডরুম। একটি দুটি নয়, হাজার হাজার অমন বাড়ি ছড়িয়ে আছে সারা কলকাতায়। পুবে উত্তরেই বেশি।

দক্ষিণেও কম নয়। এমন একটি বাড়ি দেখেছি দক্ষিণ কলকাতায়, যা' আর সবাইকে হার মানায়। কবীর রোড আর এস আর দাশ রোডের মোড়ে এক খুপরি বাড়ি দেখে আমার সেদিন চক্ষু চড়ক গাছ।

চারিদিকে মাথা তোলা বিরাট বিরাট পাকা বাড়ি। তারই মাঝখানে এক পানের দোকানের পাশে একটি পরিবারের আস্তানা। ছোট্ট একফালি ঘর। তিনি ফুট বাই তিন ফুট। ছোট্ট পানের দোকানের সাইজ। পানের দোকানের মতই দরজা নেই, জানালা নেই, সামনে শুধু ঝাঁপ। এই ঝাঁপের ভেতর একখানা খুদে তক্তপোষ। তাও প্রায় গোটা ঘর জুড়ে। তক্তপোষে জবুথবু বসে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। গায়ের নামাবলী, সামনের করকোষ্ঠি দেখে মনে হল, পেশায় জ্যোতিষী। তক্তপোষের চারধারে টিনের দেয়াল তাক। সেখানে ঝোলানো ছেঁড়া মলিন বই। পঞ্জিকা। পঞ্জিকার পাশেই, পেরেকে টাঙানো একখানা শাড়ি আর লাল গামছা।

এখানে শাড়ি? চোখ ফেরাতেই দেখি এক অনূঢ়া—বোধহয় জ্যোতিষীরই কন্যা—এক মনে তক্তপোষের তলায় তরকারী কুটছেন। পাশে রান্নাবান্নার বাসন। ঘরকন্নার রকমারি উপকরণ। সামনে ফুটপাতে শিল-নোড়া, তোলা উনুন। বরাত ভাল, সেখানেই কর্পোরেশনের টিউবওয়েল। স্নান, বাসন-মাজা, কাপড়-কাচার ঝঞ্ঝাট কম।

দিনের বেলায় ঝাঁপ ওঠে। জ্যোতিষী নামাবলী গায়ে

তক্তপোষে হেলান দিয়ে বসেন। খক্ খক্ কাশেন। আসেন ভাগ্যান্বেষীরা। কথাবার্তা হয়। রোজগারও নিশ্চয় হয়। নইলে পরিবারের পেট চলে কী করে? অনূঢ়া কন্যাটি যখন কাজ করেন না তক্তপোষের তলায়, ফুটপাতের এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ান। অন্য সময় তক্তপোশের এক কোণে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকেন।

মাঝে মাঝে দেখেছি, কোথা থেকে যেন আরও লোক আসেন। বোধ হয় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন। তখন ভাগ্যান্বেষী খদ্দেরের দল জ্যোতিষীর কাছে আসেন না। তক্তপোষের ওপর গল্প জমে। জ্যোতিষী পাশে কুকুরকুণ্ডলী মেরে শুয়ে থাকেন। দুপুরের রোদ এসে ঝাপটা মারে ঘরে। রোদ আড়াল করতে কোন কোন দিন শাড়ির পর্দা পড়ে। এই চলছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। পেশা, নেশা, আহার, নিদ্রা সব।

অনেক দিন ইচ্ছে হয়েছে ঐ জ্যোতিষীর সঙ্গে আলাপ করি, জেনে আসি কী করে চলে তাঁদের এই ছোট ঘরে, কেনই বা পড়ে আছেন এখানে। দীর্ঘ শ্মশ্রুর মাঝখানে রক্তচক্ষু দেখে এগোতে সাহস হয়নি। পরিবারটা আমার কাছে রহস্যময়ই থেকে গেছে।

শুধু এটির কথাই বা বলি কেন, এমনি অসংখ্য বাড়ি আছে কলকাতায়—যেখানে নানারকম কায়দাকানুন জানা না থাকলে বাস করা অসম্ভব। সাত আট জনের এক একটি পরিবারকে দশ ফুট বাই দশ ফুট একটিমাত্র ঘরে দিন চালাতে, রাত কাটাতে হয়। দিন যাপনের প্রাণ ধারণের গ্লানি নিয়ে তাদের বছরের পর বছর কাটছে। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের পালাবদল চলছে। হঠাৎ যখন দম আটকায়, কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েন কাছে-পিঠে কিংবা দূরে। ঘুরে ফিরে কিন্তু ফের কলকাতা। অজগরের নিঃশ্বাসের মত

শহরটা মানুষ টানে, আর ফেলে দেয় সেই সনাতন জঠরে। বেরোবার পথ কোথায়? মুখে যতই গালাগালি করি না কেন, কাজের বেলায় আমরাও দেখি, '—ছাড়ায়ে যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।'



পথের দেবতা

'তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজিদে'—

কুষ্টিয়ার বাউল লালন ফকির কি কলকাতার পথঘাটের কথা ভেবেই, এই গানটি বেঁধেছিলেন? হয়ত তাই। পথ-দেবতাদের এত ভিড় কলকাতা ছাড়া আর কোথায়? দু'পা এগোতে না এগোতেই শিবের মন্দির, কালীর মন্দির, অমুক মসজিদ, অমুক দরগা। নানা সম্প্রদায়ী গির্জেরও অভাব নেই। ফুটপাতের গায়ে, সদর রাস্তার মাঝখানে খাড়া হয়ে আছে এক একটা মন্দির, বটগাছের গোড়ায় মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তেল-সিঁদুরমাখা শিবলিঙ্গ। নগরবাসীর পথ আগলাচ্ছেন এক একজন জাগ্রত দেবতা।

কবে কখন এঁদের প্রতিষ্ঠা জানা নেই। অনেকে আবার হাল আমলের। এইতো সেদিন শেয়ালদার কাছে এক নূতন দেবতার জন্ম হয়ে গেল। সার্কুলার রোডে শিবরাত্রির দিন কয়েকজন হিন্দুস্থানী ফুটপাতের ওপরে এক নিমগাছের চারদিকে বেদী তৈরী

করে শিবঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছে। ত্রিশূল গেড়েছে, ফুল বেলপাতা ছড়িয়েছে, পাথররূপী শিবের গায়ে তেলসিঁদুর মাখিয়েছে, প্রণামীর থালা পর্যন্ত সামনে রেখেছে। আয়োজনের ত্রুটি নেই। বেচারা পথচারীদেরই মুশকিল।

মুশকিলই বা বলি কি করে। আসতে যেতে অনেকেরই হাত ঠেকবে কপালে, কেউ উপুড় হয়ে পড়বেন বেদীতে, থালায় ঠুংঠাং প্রণামীর পয়সাও পড়বে। আরও কয়েক বছর পেরিয়ে যাক, এই শিবঠাকুরের কৌলীন্য বাড়বে, অনেক কাহিনী, কিংবদন্তীও শিব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। কয়েকজন হিন্দুস্থানী হঠাৎ রাতা-রাতি শিব প্রতিষ্ঠা করছে—একথা বললে তখনকার ভক্তরা তেড়ে মারতে আসবেন।

কলকাতার আরও অনেক পথ-দেবতার জন্ম হয়ত এইভাবেই। এঁদের সংখ্যা চার-পাঁচ শতের কম নয়। মসজিদ দরগার সংখ্যাও শতক ছাড়িয়ে। সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে মনে হয়, গোটা শহরটাই একদিন ঠাকুরদেবতাদের খাসতালুক হয়ে দাঁড়াবে। সাধারণ মানুষকে তল্পীতল্পা গুটিয়ে অন্য কোথাও সরে পড়তে হবে।

নগরদর্শনে বেরিয়ে অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, পথ চলতি লোকদের এই পথদেবতাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা কী পরিমাণ! দু'পা এগিয়েই প্রণাম। ট্যাক্সি-ড্রাইভার, ট্রামের কণ্ডাক্টার হাজার কাজের ফাঁকেও কপালে হাত ঠেকায়। অফিসযাত্রীদের তো কথাই নেই। ট্রামেবাসে প্রায়ই দেখা যায়, যাত্রীদের অনেকে পরম-ভক্তিভাবে কপালে হাত ঠেকাচ্ছেন। অর্থাৎ কাছাকাছি কোথাও কোন জাগ্রত দেবতা আছেন। আমার চেনা এক ভদ্রলোক শ্যামবাজার থেকে ডালহৌসী পর্যন্ত ট্রামে আসতে রোজ একুশবার প্রণাম সারেন। বাড়ি ফিরতে আরও একুশবার।

আর এক ভদ্রলোকের রীতি চমৎকার। তিনি ট্রামে উঠেই ঘুম দেন। ঘুম ভাঙে এসপ্ল্যানেডে এসে। পথে কোথায় কোন দেবমন্দির আছে তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যেই তিনি প্রণামের ব্যাপারটা সেরে নেন। ট্রাম চলছে, ঢুলুনিতে ঘুমও চলছে, আর ফাঁকে ফাঁকে কপালে হাত উঠছে, নামছে। গত কুড়ি বছর ধরে নাকি তাঁর এদিক সেদিক হয়নি।

ভদ্রলোকের ধর্মজ্ঞানের ও সময়জ্ঞানের তারিফ করি।



দুই আসর

জিরাফ-গলা কুঁজোর মুখে ঘোমটা পরিয়ে সারি সারি টেবিল-ল্যাম্পে ড্রয়িংরুম সাজানোর কায়দা দেখেছি। এবারে দেখলাম, ঢাক-ঢোল-মাদল আর তীর ধনুকে ঘর সাজানোর নতুন কায়দা। আসবাব-বিরল ঘরখানা ঐ সামান্য ক'টি জিনিসের চমৎকার সংস্থাপনায় অসামান্য রূপ নিয়েছে।

পশ্চিম জর্মন দূতাবাসের ভাইস-কন্‌সাল ডক্টর ফিশারের বাড়ির কথা বলছি। দক্ষিণ কলকাতায় আয়রন সাইড রোডের ঐ "গরিব খানায়" সেদিন আমাদের ক'জনের আসর বসেছিল। সুঠামদেহী ডক্টর ফিশার অমায়িক এবং বন্ধুবৎসল। খেতে খাওয়াতে ভাল বাসেন, অট্টহাস্যে পাড়া কাঁপাতে পারেন এবং সদ্যোশেখা দু'চারটে

বাঙলা শব্দে ইংরেজী বাক্যাবলী 'পাঞ্চ্' করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডার খোরাক জোটান।

এহো বাহ্য, প্রথমেই নজরে পড়ে ডক্টর ফিশারের রুচি। ঘরের চারধারে, আসবাব উপকরণে সেই রুচির স্নিগ্ধ ছাপ। সারা ভারতের বাছাই করা কুটিরশিল্পের নমুনা দিয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে কী চমৎকার ঘর সাজানো। দেয়ালে একটি কি দুটি অয়েল পেন্টিং। চোখ মন দুই-ই জুড়িয়ে যায়।

(এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পরলোকগত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নীরব শিল্পী রথীন্দ্রনাথ নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বিপ্লব ঘটিয়ে গিয়েছেন তার খবর কজন রাখে। দেশী বিদেশী উপকরণে, ফরাসে, সোফায় ড্রয়িংরুম সাজানোর বহু প্রচলিত বর্তমান "শান্তিনিকেতন" রীতি রথীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। শিল্পের সামান্য স্পর্শ দিয়ে তুচ্ছ জিনিসকে মাহিমান্বিত করার এবং তাকে কাজে লাগানোর জাদু নানাভাবে তিনিই আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন। চামড়ার গায়ে নক্সা তোলা, বাটিকের কাজ, কাঠের কাজে অভিনবত্ব—সবই। এদেশে ঘরের ভেতরে শুধু নয় ঘরের বাইরেও তাঁর শিল্পী হাতের ভোজাবাজি দেখা গিয়েছে। উত্তরায়ণের বাগানে লতানো আম গাছ, পেয়ারা গাছ, নেবু গাছ' দেখে এখনো দর্শকের বিস্ময় জাগে। জাপানী ও ভারতীয় রীতির মিশ্রণ ঘটিয়ে উদ্যান রচনা রথীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি। জাত-শিল্পী রথীন্দ্রনাথ আজ পরলোকে। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করি।)

ডক্টর ফিশারের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল একথা সেকথা। ভারতের ভাষা-সমস্যা, শাস্ত্রী-সূত্র, বিড়লা-ক্রুশ্চফ সাক্ষাৎ, জর্মন উচ্চারণ, কিছুই বাদ পড়েনি। হঠাৎ একজন জিগগেস করে

বসেন—"আচ্ছা, বলতে পার ফিশার যুদ্ধের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতির পর এত অল্প দিনে তোমাদের দেশের অত্যাশ্চর্য উন্নতির কারণটা কী? কোন্ শক্তি তোমাদের জাতকে এত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে?"

ডক্টর ফিশার চটপট জবাব দিলেন—"সে শক্তির নাম ক্ষুধা।"

"তোমরা তো জানো না"—ডক্টর ফিশার বলে চলেন—"যুদ্ধের পর আমাদের দেশে কী ভয়ানক দুরবস্থা। চারিদিকে হাহাকার। সব ছাপিয়ে পুরোভাগে এসে দাঁড়াল বুভুক্ষার বিভীষিকা। সকলের মুখে 'হা-রুটি হা-রুটি।' ক্ষুধাকে জয় করার সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই আমাদের শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে দিল।"

"শুধু কি তাই"—আর একজন প্রশ্ন করেন—"তোমাদের দেশের কারিগরি ঔৎকর্ষও কি উন্নতির কারণ নয়?"—

"কিছুটা হয়ত তাই"—ডক্টর ফিশার বলেন—"কিন্তু আসল কারণ ঐ ক্ষুধাই, এবং তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে শ্রমের মর্যাদা। আজ যে বড়লোক—কোন কোম্পানীর মালিক বা অন্য কিছু—সেও পরদিন কারখানায় হাতুড়ি পেটাতে লজ্জা পায় না। এই তো দেখো না, আমার এক মামা ছিলেন কোন ক্যামেরা কোম্পানীর ডিরেক্টার। সব ছেড়েছুড়ে তিনিই দেখি একদিন ইট তৈরীর সাধারণ শ্রমিক। মনে কোন আক্ষেপ নেই, ফুর্তিসে কাজ করে যাচ্ছেন। শুধু আমার মামা নয়, এই রকম দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে। এবং এইভাবেই কাজের মধ্য দিয়ে আমরা ক্ষুধাকে জয় করেছি।"

আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে পাশে বসা বাঙালী বন্ধুটি বললেন—"ক্ষুধাকে জয় করার সহজ সরল পদ্ধতি আমাদেরও জানা আছে। ভিক্ষের ঝুলি থাকতে আমরা কাউকে ভয় পাই না—"

বন্ধুটিকে আমি সভয়ে বলি—"চুপ, চুপ, ডক্টর ফিশার আবার শুনতে না পায়।"

আর একদিনের কথা। সেদিনও পার্টি ফিশারের বাড়িতে। সেদিন আলাপ এক জর্মন রাজকুমারের সঙ্গে।

আমার এক তামিল বন্ধু ছিল। তার নাম "মুথু।" পরিচয়ের কয়েকদিন পর সে জানাল তার পুরো নাম হচ্ছে—ত্তিবারম্ কৃষ্ণমূর্তি মুথু বেঙ্কটরমণ চেট্টিয়ার পদ্মনাভন তাম্বি।

এই দেড়গজী নাম শুনে "সমর সেন,—অমিত রায়ের" দেশের লোক আমি মূর্ছা যাই আর কি। পরে শুনেছি দক্ষিণ ভারতীয় নামে বাপ-ঠাকুর্দার নাম, গ্রামের নাম, জেলার নাম, নদীর নাম—অর্থাৎ শুধু পোস্টঅফিসের নাম বাদ দিয়ে পুরো ঠিকানা, কুলপঞ্জী ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ইত্যাদি সব কিছুই ঠেসে দেওয়ার রীতি চালু রয়েছে।

কিন্তু এ আর এমন কি, ফিশারের বাড়িতে ওই জর্মন প্রিন্সের নাম শুনে ধপ করে সোফায় বসে পড়েছিলাম। করমর্দনের প্রাক্কালে পরিচয় দিতে গিয়ে ফিশার কী যেন বললেন। মনে হল, শব্দোচ্চারণ নয়, পেতলের ঘটিতে এক ডজন সুপুরি পুরে কেউ যেন প্রবল আক্রোশে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর জানা গেল, এই বিশিষ্ট অতিথির নাম "প্রিন্স হুবেরটুস ৎসু ল্যোবেনস্টাইন ভার্থাইম ফ্রয়েডেনবার্গ।"

ভারতীয় রাজকুমার অনেক দেখেছি, জর্মন প্রিন্স দর্শন এই প্রথম। প্রিন্সের বয়স পঞ্চান্ন। দীর্ঘদেহ, খড়্গনাসা, বিরলকেশ। তিনি পশ্চিম জর্মনীর প্রেস অ্যাণ্ড ইনফরমেশনের স্পেশ্যাল আড-ভাইজার। আগে ছিলেন জর্মন বুণ্ডেস্টাগের সদস্য। নামকরা ঐতিহাসিক। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "ফ্যাসীবাদ ও গণতন্ত্র। ১৯৩৩ সনে স্বদেশ ছাড়েন। কারণ তখনকার সরকারের সঙ্গে মত-বিরোধ। আমেরিকা ও কানাডার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘকাল। তাঁর লেখা বইগুলিও বিশ্বখ্যাত। তন্মধ্যে

বিশেষ উল্লেখযোগ্য—"আফটার হিটলারস্ ফল", "ডেস্টিনি অব জর্মনী।" সম্প্রতি বেরিয়েছে "ডিফেন্স অব দি ওয়েস্ট।"

সেদিনের আসরে কলকাতার কয়েকজন জ্ঞানীগুণী ছিলেন। আর ছিলেন কলকাতার নূতন জর্মন কন্সাল জেনারেল ডক্টর রুয়েটে। বার্লিন সমস্যা, মেগাটন বোমা, পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট দলের প্রভাব, রুশ দূতাবাসের সন্মুখে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের বিক্ষোভ, ভারতের তৃতীয় পাঁচসালা যোজনা, নেহরুর মার্কিন দেশ সফর ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রিন্স কিন্তু ঘুরে ফিরে জিগগেস করেন পি সি সরকারের কথা। চোখে-মুখে বিস্ময় মাখিয়ে বললেন—"উফ্, সাংঘাতিক লোক, এ গ্রেট ম্যান, আজ সকালে আমাকে আচ্ছা বোকা বানিয়ে দিয়েছেন সরকার।"

"আপনি কি তাঁর নাম আগে শোনেন নি?—"

"না, এই প্রথম আজ শুনলাম। এত বড় ম্যাজিসিয়ান যে কলকাতায় আছে জানতাম না। ওঁর সঙ্গে আমার আরও আলাপ করতে হবে।"

কথার মোড় আবার ঘুরল রাজনীতিতে। খানিকক্ষণ যেতেই প্রিন্স প্রশ্ন করেন—'আচ্ছা, ভারতের সিনেমা কী রকম?

জবাব দেন ডক্টর ফিশার। বলেন—"ভাল ভারতীয় ছবি মানেই বাংলা ছবি। একসেলেন্ট"!

"তাই নাকি? দেখতে হবে তাহলে—" প্রিন্সের কথায় খানিকটা বিস্ময়!

ফিশার তাঁর কাছে নাম করেন, পথের পাঁচালীর, কাবুলী-ওয়ালার, দেবীর। প্রিন্স বলেন, নামই শুনিনি।

তিনি জানতে চান, সাবু এখন কোথায়? "দ্যাট এলিফেন্ট বয় সাবু—।"

আমি বলি—"ও এখন হলিউডের সম্পত্তি, ভারতের নয়। ভারতীয় ছবিতে সে পার্ট করে না।"

পি সি সরকার থেকে আলোচনা নামল সাবুতে। আমার পাশের ভদ্রলোকটি ফিস্ ফিস্ করে বলেন—"এই রে, সেরেছে, এখন আবার সাপখোপ, ইণ্ডিয়ান "ইয়োগীতে" আলোচনা না চলে যায়।"

না, যায়নি। ওদিকে ডিনারের ডাক পড়ে গেছে।



হার্টমুট কেল্লের

বার্লিন, মুনিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঁচ দিনের নগরদর্শনে এসেছেন দশজন জর্মন ছাত্র। তাঁদের সঙ্গে দোস্তী করতে সেদিন ডাকা হয়েছিল আমাদের মত অল্প কয়জন সাংবাদিককে।

ঘরের কোণায় কোণায় ছোট্ট টেবিল। বেয়ারার হাতে চায়ের পট, প্যাস্ট্রীর প্লেট। তদারকি করে বেড়াচ্ছেন ডক্টর ফিশার আর কনস্যুলেটের অক্লান্ত-কর্মী অসীম কর। পরিচয় বিনিময়ের পর আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা জুতে দেওয়া হল এক একজন জর্মন ছাত্রের পেছনে।

আমার বরাতে জুটল এক বাঘা ইঞ্জিনীয়ার। নাম হার্টমুট কেল্লের। প্রথমে একথা সেকথা আলাপ। সে জানাল, রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক ছাত্র-আন্দোলনের জর্মন-শাখার উদ্যোগে তারা তিন

মাসের ভারত সফরে এসেছে। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দিল্লীর কাছে ওখলাতে ছিল কিছুদিন। ঘুরেফিরে এখন কলকাতায়। সফরের উদ্দেশ্য—মন দেওয়া-নেওয়া এবং ভাবের বোঝাপড়া।

পাঁচ মিনিটেই আমাদের আলাপের স্টক ফুরিয়ে এল। তার পরেই শুরু এক আজব টাগ-অব-ওয়ার। হার্টমুট কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ার। রাউরকেলা, ভাকরা-নাংগালে তার আগ্রহ। আমার ওদিকে বিন্দুমাত্র নেই। আমি তাকে ফেলতে চাই জর্মন সাহিত্য এবং জর্মনীতে ভারত-তত্ত্ব চর্চার জালে। কিন্তু সে কিছুতেই ওদিকে মাড়াবে না। কলকব্জা আর লোহালক্কড়ের ফাঁদে আমাকে উল্টো আটকাতে চায়।

হার্টমুট সবিস্তারে স্বদেশের ইঞ্জিনীয়ারিং ঐতিহ্যের নিগূঢ় রহস্য আমার কাছে উদ্ঘাটিত করে চলেছে। ছাইপাঁশ কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। একটু দম নিতেই আমি কথার মোড় ঘুরালাম। বললাম—"জানেন হের কেম্লের, এই মাত্র আপনি যে 'ইয়ুঙ্গে' শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হচ্ছে 'যুবং।' অর্থ এবং উচ্চারণ প্রায় এক। এইরকম অসংখ্য শব্দের মিলন আপনাদের জর্মনে, আর আমাদের সংস্কৃতে। যেমন ধরুন 'রাত্রিকে' আপনারা বলেন, 'নাখট্‌,' আমরা বলি 'নক্ত'।—আপনারা বলেন, ফাটের,—আমরা বলি—"

ভাষাতত্ত্বের এই আলোচনা ছোকরার যেন মনঃপূত হল না। হাউ স্ট্রেঞ্জ, দ্যাটস্‌ ফাইন ইত্যাদি বুলি আউড়েই আবার সে চলে গেল ইঞ্জিনীয়ারিং ব্যুৎপত্তির গভীরে। আমি ঘাড় নাড়ি আর সুযোগ খুঁজি কথার মোড় ঘুরাবার। কিন্তু ফাঁক পাই না। সে অনর্গল বকে চলেছে। আমি ডাইনে ঘাড় নাড়ি, বাঁয়ে ঘাড় নাড়ি, চোখেমুখে নবলব্ধ জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করি এবং হার্টমুট দ্বিগুণ

উৎসাহে কাগজ-কলম বের করে নক্সা এঁকে, অঙ্ক কষে রাতারাতি আমাকে ইঞ্জিনীয়ার বানাতে উঠেপড়ে লেগে যায়।

আমি প্রমাদ গুণি। 'মাইন গট', আর কিছুক্ষণ চললে মাথা ধরে যাবে। অনেক কায়দা-কানুন করে এবারে আমি তৈরী হয়ে নিলাম। চায়ে চুমুকে দেবার ফাঁকে "বাট্ ইউ সি হের"—বলে ম্যাক্সমুলার, ভিন্টারনিৎস, রেমার্ক, মান সবাইকে টেনে আনলাম কথা প্রসঙ্গে। শুরু করলাম বাংলাদেশে হাইনে, রিলকের জনপ্রিয়তা বর্ণনা করা। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, ছোকরা সদাশয় হলে কি হবে, নিতান্তই বেরসিক। আমার সাহিত্যালোচনায় তার বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই। সে আমাকে ইঞ্জিনীয়ার বানাইবেই বানাবে। অগত্যা হাল ছেড়ে দিলাম। হায় ভগবান, আমার কপালে ইঞ্জিনীয়ার না জুটে ইতিহাসের ছাত্র লুৎস ম্যবিয়ুস, কিংবা নিদেনপক্ষে দর্শন-শাস্ত্রের কুনো লোরেনৎস পড়লেইতো পারতো। কিংবা আলোচনা-বৈঠকে সবাই মিলে এক সঙ্গে বসলে তো কোন ক্ষতি ছিল না।

কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে, অন্য টেবিলে হাসির হুল্লোড় শুনে দুজনেই মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। চেয়ে দেখি, লুবার্ট নামে আখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র চমৎকার এক হিন্দী গান শুরু করেছে। আমি তৎক্ষণাৎ ডাঙ্কে শ্যোন—বলে হার্টমুটের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আমার তখন ভাবখানা—দাঁড়াও, গানটি শুনেই আসছি।

লুবার্ট চমৎকার হিন্দী বলে। নিজে নিজেই বই পড়ে দেশে শিখেছে। তার চমৎকার উচ্চারণ শুনে আমরা সবাই থ। আমাদের অনেকের চেয়ে-ই সে হিন্দী বলায় ওস্তাদ।

একখানা শেষ করে লুবার্ট আর একখানা হিন্দী গান ধরেছে। এমন সময় দলনেতার ঘোষণা : একঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এক্ষুনি বেরোতে হবে। অন্য এনগেজমেন্ট আছে। চল সবাই। কুইক।

কোণের দিকে তাকিয়ে দেখি, হার্টমুট তখনও আমার অপেক্ষায়

বসে আছে। আমি ছুটে গিয়ে বললাম,—কি আশ্চর্য, তোমরা এক্ষুনি চলে যাবে; অথচ আমাদের আলোচনা শেষ-ই হল না। চমৎকার লাগছিল তোমার মুখে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। আচ্ছা, গুটে নাখট! আবার হয়ত দেখা হবে।

গুটে নাখট—হার্টমুট বিদায় নিয়ে সদলবলে বেরিয়ে গেল।

পাশে দাঁড়িয়ে ডক্টর ফিশার। বললেন—চলুন, এবার খানিকক্ষণ প্রাণ-খোলা আড্ডা দেওয়া যাক। কি খাবেন বলুন—

বন্ধু-বৎসল ফিশার আমাদের দিকে ঝুঁকে দুহাত প্রসারিত করে দিলেন। আমার মাথা ধরা ছেড়ে গেছে।



বেলভেডিয়ার

বাসে দুই বন্ধুতে তর্ক। একজন বললে, 'এ বাড়িতে থাকতেন ইংরাজ সাহেব মিস্টার বেলভেডিয়ার'। আর একজন বললে, উঁহু মোটেই নয়, এ বাড়ি ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের। তর্কের হারজিত ফয়সালা হবার আগে আমি বাস থেকে নেমে গেলাম। পথ চলতে চলতে ভাবি, কি আশ্চর্য, এতদিনের এই চেনা বাড়িটির ইতিহাস আমারও তো ভাল করে জানা নেই। একদা-বিখ্যাত বেলভেডিয়ার হাউসের কুলপঞ্জী উদ্ধার করতে ঐ বাড়িটির গহ্বরেই আত্মসমর্পণ করলাম।

ইতালীর রেনেশাঁ যুগের ভাস্কর্য রীতিতে তৈরী বিরাট বিরাট সবুজ লনে ছাওয়া ঐ অতিকায় "দৈত্যপুরীর" মূল নিয়ে নানা মুনির নানা মত। মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে বাড়িটির সুরু বাগান-বাড়ি দিয়ে। প্রথম মালিক বাদশাহ আওরঙজেবের পেয়ারের নাতি নবাব আজিম-উস-সান। তিনি তখন ছিলেন বঙ্গ-বিহারের গবর্ণর। আর দশজন মোগল নবাব বাদশাহের মত তিনিও ছিলেন ফুর্তিবাজ এবং এই বাড়িতেই সুরায় সাকীতে ফুর্তির তুফান ছুটতো। বাড়িটি তৈরীর তারিখ ১৭০০ খৃষ্টাব্দ।

নানা হাত ঘুরে বাড়ি এল কর্নেল টলির হাতে। কর্নেল ছিলেন কোম্পানীর জাঁদরেল ইঞ্জিনীয়ার। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গোপালনগর গ্রাম আর জীরাট সহ বাড়িটি লীজ দেন টলিকে। বছর দুই পর তিনি কিনে নিলেন সোজাসুজি এবং নাম দিলেন বেলভেডিয়ার হাউস।

টলি মারা যেতেই বাড়িটি বিক্রীর কথা উঠল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। কিন্তু খদ্দের জোটে না। ১৭৮৪ সালে একবার, ১৮০২ সালে একবার এবং ১৮০৯ সালে আর একবার বিজ্ঞাপন দেওয়া হল বিক্রীর। কিন্তু অবস্থা যথাপূবং তথাপরং। অত বড়ো বিরাট বাড়ি লোকজনের অভাবে খাঁ খাঁ করতে লাগল।

১৮৫৪ সালে মালিক হলেন চার্লস প্রিন্সেপ। এবং তাঁর কাছ থেকেই পরে কিনে নিলেন কোম্পানী নিজে। ঠিক হল এই বাড়ীই হবে বাংলাদেশের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরের সরকারী বাসভবন। ১৮৫৪ থেকে ১৯১২—এই দীর্ঘ আটান্ন বছর বাড়ি আবার জমজমাট। কিন্তু ১৯১২ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি পালালে তার কপাল আবার পুড়ল। মালিকদের আবার সমস্যা—'কী করা যায় এ বাড়ি নিয়ে।' শেষমেষ ঠিক হল, ভাইসরয় সাহেব যখন রাজধানী দিল্লি থেকে কলকাতায় আসবেন, তখন তিনি এসে উঠবেন এবাড়িতে।

এমনিভাবে বছর পঁয়ত্রিশ চলতে চলতে এল ১৯৪৭ সাল। ভাইসরয় 'বিদায়' বলে দেশের জাহাজে উঠলেন। আবার মহাসমস্যা বেলভেডিয়ার হাউস নিয়ে। দু'বছরের বিস্তর গবেষণার পর ১৯৪৯ সালে এখানে উঠে এল ন্যাশনাল লাইব্রেরী। এখন পর্যন্ত তাই চলছে। এককালের বিলাব্যসনের আস্তনা আজ বিদ্যার্থীদের মন্দির।

এমনি কতদিন চলবে কে জানে! বেলভেডিয়ার হাউসের মাথায় তো আবার ছিট আছে, বেশিদিন একভাবে থাকতে পারে না।

বলতে ভুলে গেছি, এ বাড়ির আর একটি ইতিহাস আছে। ১৭৮০ সালের ১৭ই আগষ্ট ভোরে কাছাকাছি এক গলিতে (এখন যার নাম ডুয়েল এভিনিউ) ডুয়েল লড়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস আর ফিলিপ ফ্রান্সিস। জিতেছিলেন হেস্টিংস। গুলিবিদ্ধ ফ্রান্সিসকে ঐ ঐতিহাসিক ডুয়েলের পর শুশ্রূষার জন্যে এই বাড়িতেই এনে রাখা হয়েছিল।



জবচার্নকের আগে

ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথ "জব চার্নকের শহর" তোলপাড় করে এলেন, দেখলেন, চলে গেলেন। গত হপ্তার কদিনে 'রানী বিনে গীত নাই'। রুজ লিপস্টিক আর ঘসামাজায় শহরের শরীরে এসেছিল নতুন যৌবন, রাজভবন হয়েছিল 'রানীভবন,' দু'চোখকে ধাক্কা দিয়ে এখানে সেখানে হঠাৎ দেখা গিয়েছিল সেই অনেককালের চেনা ইউনিয়ন জ্যাক, চারদিকে আলোর রোশনাই, হৈ চৈ হট্টগোল।

ব্যস, দুদিনের খেলা খতম, এখন আবার যে-কে সেই। পড়ে রইল শুধু রানীর স্মৃতি কয়েকখানা ফোয়ারা আর খবরের কাগজের কাটিং।

ইংলণ্ডেশ্বরীর নগর দর্শন প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ইংরেজ সাহেব জব চার্নকের কথা। অনেকের ধারণা—অনেকের কেন প্রায় সকলেরই —ইংরেজ আসার আগে কলকাতা শহরের অস্তিত্ব ছিল না। এ জায়গা যেন ছিল অখ্যাত অবজ্ঞাত এক ক্ষুদ্র পল্লী। এবং নগরের পত্তনকারী হচ্ছেন জব চার্নক।

কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। জব চার্নক এ জায়গার বোলবোলাও নাম ডাক বাড়িয়েছেন ঠিকই; কিন্তু তারও অনেক আগে কলকাতা ছিল কলকাতাতেই এবং ছিল উল্লেখযোগ্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান।

জব চার্নক কলকাতার মাটিতে পা দিয়েছিলেন কবে? আনুমানিক ১৬৯৪।৯৫ খৃষ্টাব্দে। তখন সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা এই তিনটি গ্রাম নিয়ে ছিল এখনকার এই এলাকা। সুতানুটি গোবিন্দপুরের কথা তেমন উল্লেখ নেই, কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কলকাতার নাম অজস্র। বিখ্যাত জায়গা না হলে বারবার কি এই নাম কেউ দিত?

জব চার্নকের আসার প্রায় দু'শ বছর আগে বিপ্রদাস পিপিলাই, তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে লিখেছেন,—

পূর্ব কূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা,
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদো মহারথা॥

জব চার্নকের কলকাতায় আসার তিন বছর আগে লেখা 'নারদপুরাণ' নামে এক কাব্য পাওয়া গেছে। লেখক কৃষ্ণদাস। তিনি নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে ঐ বইয়ে লিখছেন,—

আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম।
সাকিম কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥

দশ দশ শত নিরেনব্বুই সালে,
মাহ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পুস্তক রচিলে ॥

দেখলেন তো, শুধু কলকাতা নয়, 'বহুবাজারের' নাম পর্যন্ত পেয়ে গেলেন। আরও আছে। জব চার্নক ঠিক যে বছর কলকাতায় পা দেন, প্রায় ঐ সময়েই লেখা সনাতন ঘোষাল বিদ্যাবাগীশ নামে এক বাঙালী কবির 'ভাষা ভাগবত' পুঁথি সম্প্রতি পাওয়া গেছে। তাতে লেখা আছে,—

কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ।
তাঁর পুত্র ভুবন বিদিত রামচন্দ্র ॥
তাঁহার মধ্যমপুত্র করি শিশুলীলা।
ভাষাভাবগত বিদ্যাবাগীশ রচিলা ॥

কলকাতার নাম জড়িয়ে একটি বংশের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সহজেই অনুমান করতে পারেন, ইংরেজ আসার আগেই এ জায়গা বিখ্যাত ছিল। শুধু তাই নয়, ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ফানডেন ব্রোক নামে এক পর্তুগীজ বণিক যে মানচিত্র এঁকেছিলেন, তাতে ভাগীরথীর পুব পারে 'ক্যালকাটা' বন্দরের নাম পরিষ্কার লেখা আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, (ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা, কুচিনান, দুইকূলে বসাইয়া বাট।") তারও আগের "আইন-ই আকবরীতে কলকাতার নাম ঘটা করে দেওয়া আছে। এমনও জানা গেছে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে গুরু নানক কলকাতায় ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন।

এত নজীরের পরও যদি বলা হয়, কলকাতার পত্তনকারী হচ্ছেন এক ইংরেজ সাহেব, তাহলে আমরা নাচার।



কিসিংগার

কলেজ স্ট্রীটে ডাবের বাজার, শেয়ালদা স্টেশনের সামনে ভিড়, ঠনঠনে কালীবাড়ি, ফুটপাতে রিফিউজির দোকান—কিছুই ওঁদের নজর এড়ায় না। যা দেখেন, তাতেই মুগ্ধ। একজন বলেন—'ওহ, রীয়্যালি', আরজন বলেন—'হাউ লাভলি!'

কিসিংগার-দম্পতির সঙ্গে নগরদর্শনে বেরিয়েছিলাম। গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে কলেজ স্ট্রীট হয়ে শ্যামবাজার। সার্কুলার রোড সি-আই-টি রোড ধরে যাদবপুর। লেক, বালীগঞ্জ, পার্ক স্ট্রীট হয়ে ফের চৌরঙ্গী। গাড়ীতে ওঁরা দুজন ছাড়া আমি আর আমার দুই সাংবাদিক বন্ধু—গৌরকিশোর ঘোষ ও অজিত দাস।

ডক্টর কিসিংগার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক, বিখ্যাত কয়েকখানা বইয়ের লেখক এবং প্রেসিডেণ্ট কেনেডির অন্যতম পরামর্শদাতা। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা, বয়স আটত্রিশ।

অলকাধরা মিসিস কিসিংগার কৃশাঙ্গী। মৃদুহাসিনী এবং মৃদু ভাষিণী। নয়াদিল্লি ঘুরে দুজনে কলকাতায় এসেছেন বেড়াতে। ডক্টর কয়েক জায়গায় বক্তৃতাও দিচ্ছেন।

চৌরঙ্গীর মোড় থেকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে গাড়ি পড়তেই ডক্টর বলেন—'দেখুন, নয়াদিল্লিতে আমার কয়েকটি মন্তব্য নিয়ে পাকিস্তানে দারুণ হৈচৈ হচ্ছে। তা হোক, আমি যা ভাল বুঝেছি,

বা মনে করেছি, তাই বলেছি। আমার মতামত নিতান্তই ব্যক্তিগত —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়।'

গাড়ি ভিড় ঠেলে এগোয় আর ওরা প্রশ্নের পর প্রশ্নে কৌতূহল মেটান। এটা কী, ওটা কেন—বলে বলে সব বিষয়েই যেন ওকীবহাল হতে চান।

"পথের মাঝখানে ওটা কি?—টেম্পল! এই রকম অনেক আছে নাকি? মাই গড!—আচ্ছা এই তাহলে ফেমাস ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। আর ওদিকে? সুইমিং পুল! হাউ লাভলি। এই রকম অনেক পুকুর আছে তাহলে। 'ওহ্ রীয়্যালি' এই তোমাদের খাঁটি বাঙ্গালী হোটেল। কী খেতে দেয়? ভাত মাছ ডাল—ভারী সস্তা তো'! আচ্ছা, কেবিনগুলোতে 'লেডিজ' লেখা কেন? ট্রামে-বাসেও তাই লেখা থাকে?—আই সি, এরাই সেই রিফিউজি! হাউ পিটি! আচ্ছা ওরা দেশ ছেড়ে কেন চলে এল? প্রাণের ভয় আর ইজ্জতের ভয়। ইজ দ্যাট সো! এখানে কারা থাকে? মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবার! বেশ ছিমছাম তো! কলকাতায় তাহলে অনেক মুসলমান আছে! অ্যাণ্ড দিস ইজ ইওর ময়দান, কী সুন্দর সবুজ। হাউ লাভলি!"

আড়াই ঘণ্টার নগরদর্শন সাঙ্গ করে ডক্টর কিসিংগার যখন বিদায় নিতে চান, তাঁর হাতে এক কপি 'আনন্দবাজার' গুঁজে দিই। আনন্দবাজারের প্রচার-সংখ্যা সর্বাধিক জেনে আনন্দ প্রকাশ করেন।

বলেন, কলকাতার স্যুভেনির হিসেবে আমার কাছে এই কাগজটা থাকবে। আর কী বলব, তোমাদের এই শহর সত্যি সত্যি ওয়াণ্ডারফুল। এতদিন পরে মনে হচ্ছে ইণ্ডিয়াতে এসেছি। নয়াদিল্লি যেন কী রকম কী রকম! দেখে চোখ জুড়োয় না। ওহ্ রীয়্যালি, এই ভিড়, সবুজ আর নীলে এই মাখামাখি, এই—

ডক্টরের কথা শেষ না হতেই মিসিস কিসিংগার আপন মনেই বলে ওঠেন– 'হাউ লাভলি।'

আমরা বললুম—এই 'লাভলি' সকালের কথা আমাদের অনেক দিন মনে থাকবে।

'আমাদেরও'—কিসিংগার দম্পতির কণ্ঠ একসঙ্গে বেজে ওঠে।



স্টিফেন হে

'কি মোশাই, কেমোন আছেন?—ফিরে তাকিয়ে দেখি পরিচিত মুখ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বিচিত্রাভবনের তলায় আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার স্টিফেন হে। অনেকদিন পরে দেখা। হে আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

অদ্ভুত চরিত্রের লোক এই মিস্টার হে। জাতে মার্কিন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অনেকদিন ছিলেন জাপান, ব্যাংকক, সাইগন, হংকং—পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায়। তারপর ঘুরতে ঘুরতে একদিন শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পড়াশোনা করতে, বাংলা শিখতে। হে সাহেবের গবেষণার বিষয় 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব এশিয়া।' বাংলা দেশে আসার আগেই তিনি বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন। লিখতে ও পড়তে পারেন; বাকি ছিল বাংলায় কথা বলাটা ঝালিয়ে নেওয়া, আর রবীন্দ্র সাহিত্যের রস আস্বাদন করা।

বছর কয়েক আগেকার কথা বলছি। শান্তিনিকেতনে রোজ সকাল বিকেল দেখা যেত, হে রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রী' বইটা নিয়ে তন্ময়, রবীন্দ্রসদনে ঢুকে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-এশিয়া ও চীন-জাপান ভ্রমণের নানা তথ্য নিয়ে মশগুল। আমি তাঁকে বাংলার তালিম দিতাম। কয়েক মাস যেতে না যেতেই বাংলা ভাষা এল তাঁর ঠোঁটের ডগায়, কারও সঙ্গে আর ইংরেজীতে কথা বলেন না, বাংলা ভাষাতেই খই ফোটান।

পরলোকগত কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের হাজারীয়ান স্ত্রী এটা ঘোষের বাড়িতে একদিন খাবার নেমন্তন্ন। সস্ত্রীক হে, আমি, গান্ধীজীর পৌত্রী দেবদাস-দুহিতা শ্রীমতী তারা এবং আরও কয়েকজন। খাবার টেবিলে কথায় কথায় শুরু হল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে আলোচনা। দীর্ঘাঙ্গী সুদর্শনা শ্রীমতী তারা ফস্ করে বলে বসলেন, 'ভাষার লালিত্যে আর মাধুর্যে ভারতের আর কোন ভাষাই উর্দুর ধার কাছ দিয়ে যেতে পারে না।' আমার মৃদু আপত্তি বেরিয়ে আসার আগেই হে সাহেব প্রায় চেঁচিয়েই বললেন, "উঁহু, আপনি ভুল বলছেন, বাংলা ভাষার কাছে অন্য কোন ভাষাই লাগে না। উর্দুও আমি পড়েছি। কিন্তু বাংলা সুপার্ব, অনন্য।"

সেদিন বাংলা ভাষাকে সম্মানের আসনে, শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন মার্কিন-যুবক স্টিফেন হে। নিঃসংশয়ে বলতে পারি, সেদিন হে'র ওকালতি দেখে নিরপেক্ষ যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি সেই বাংলা-উর্দু বিতর্কে বাংলা ভাষার পক্ষেই রায় দিতেন। শ্রীমতী তারা শেষমেষ হার মেনে একগাল হেসে বললেন, "আপনার সঙ্গে কথায় পারা দায় মিস্টার হে।"

প্লেটে এতক্ষণ অনাদৃত চিকেন রোস্টের প্রতি একটু আগে মনোনিবিষ্ট হে মুচকি মুচকি হাসেন।

ঐ ঘটনার কয়েকদিন পরেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল শ্রীমতী তারা গান্ধী বিয়ে করছেন খ্যাতনামা বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যকে। আমি হে-কে রসিকতা করে বলি, "দেখলেন তো মিস্টার হে, সেদিনকার আপনার ওকালতির ফল, শ্রীমতী তারা বাংলা দেশের গৃহিণী হতে চললেন।"

হে পাল্টা পরিহাসের সুরে জবাব দেন—"আমি আগেই জানতাম মিস গাণ্ডী প্রোফেসার ভট্টাচারিয়াকে বিয়ে করবেন, তাই তো এত সাহসের সঙ্গে সেদিন তর্ক করতে পেরেছি।"

সেই হে গত কিছুকাল কলকাতায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও রামমোহন সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করতে। থাকতেন উত্তর কলকাতায় হেদুয়ার কাছেই এক সাধারণ বাড়ি ভাড়া করে। এক ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে। দিনরাত পড়াশোনা। বাড়িতে ঢুকলেই দেখা যেত পাজামা পাঞ্জাবী পরে মেঝের ওপর শীতল পাটি বিছিয়ে একটা নীচু ডেস্কে ঝুঁকে হে পড়াশোনা করছেন।

মাঝে মাঝে যেতেন বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগে। ঐ সূত্রেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে সেদিন দেখা। বললেন, "আর বেশি দিন না, শীগগীরই দেশে ফিরে যাব। আমেরিকায় রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পালনের তোড়জোড় চলছে। আমি শতবার্ষিকী কমিটিতে আছি।"



হাইনৎস মোডে

এ আবার কী ধরনের সাহেব—স্টেটসম্যান পড়ে না, রোজ ভোর-বেলা ঘুম থেকে উঠে পড়ে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড। পড়শী 'বাঙালী-সাহেবরা' নাক সিঁটকান, হকার বিস্ময়বোধ করে, ঝি-চাকরেরা সন্দিগ্ধ হয়। ডক্টর মোডে সবাইকে বলেন, "কলকাতায় এসে স্টেটসম্যান পড়ব কেন? বাঙলা ভাষা জানা থাকলে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড নয়, আনন্দবাজারই পড়তাম।"

মাস পাঁচ ছয় হয় ডক্টর হাইনৎস্ মোডে এসেছেন কলকাতায়, বছর দুই স্থায়িভাবে থাকতে। প্রথমে উঠেছিলেন গ্র্যাণ্ড হোটেলে, তারপর পণ্ডিতিয়া প্লেস এক্সটেনসনে বাড়ি ভাড়া করে খাস বাঙালী পাড়ায়।

আমার এক জর্মন বন্ধু ডক্টর ভিলহেলম রাউ বলতেন, খৃস্টের জন্মের পর থেকে যা যা ঘটেছে, তার কিছুই তিনি জানেন না। তবে হ্যাঁ, খৃস্টের জন্মের আগের যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি সঠিক জবাব দিতে পারবেন।

ডক্টর মোডেও তাই। পুরাতত্ত্বের তিনি বাঘা পণ্ডিত, বিশেষ করে ভারততত্ত্বের। মাহেন্‌জোদাড়োর একশৃঙ্গীদের পারিবারিক ইতিহাস, মহারাজ দশরথের ঠাকুর্দার বদখেয়াল, ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে কী কী গাছ ছিল, কোন ফুল ফুটত সরযু নদীর তীরে ইত্যাদি সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে।

আর তাঁর বাড়ি যদি যান, আশ্চর্য হবেন অদ্ভুত অদ্ভুত বিচিত্র জিনিসের সংগ্রহ দেখে। বাংলা দেশের কোন এক অখ্যাত গ্রামের পুঁথির পাটা, প্রাচীন মেসোপটোমিয়ার কাঠের পুতুল, উজবেকিস্থানের অধুনালুপ্ত আলখাল্লা, গুজরাতের এক নদীর পারে পাওয়া শিবমূর্তি,—কিছুই বাদ পড়েনি। ডক্টর মোডের বাতিকই প্রাচীন নানা জিনিস সংগ্রহে। বিশেষত লোকশিল্পের।

মোডের দেশ পূর্ব জর্মনিতে। কলকাতায় এসেছেন ভারততত্ত্ব সম্পর্কে আরও পড়াশুনা করতে। জর্মনির হা-লে শহরে মার্টিন লুথার বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ইনষ্টিট্যুট অব আর্কিওলজির ডিরেক্টার এবং ওরিয়েন্টাল আর্কিওলজির প্রফেসার।

ডক্টর মোডে প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষের একজন 'অথরিটি' তিনি ভারত আর সিংহলের বহু জায়গায় ঘুরেছেন, লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ এবং জর্মন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে কয়েকটি বহু প্রশংসিত মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ।

এতদিন জানতুম না, হঠাৎ সেদিন ডক্টর মোডের মুখ থেকেই শুনলুম, রবীন্দ্রনাথ যখন বেঁচে, বেশ কিছুদিন তিনি তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনে,—ভারতবর্ষকে জানতে আর ভারততত্ত্ব সম্পর্কে পড়াশোনা করতে। ডক্টর মোডে এখনও বলেন, "শান্টিনিকেটান ইজ মাঈ স্পিরিচুয়্যাল হোম।"

মোডের শখ বাংলা শেখায়। কিন্তু বলেন, "বয়স হয়েছে, এখন নতুন ভাষা শিখতে ভীষণ কষ্ট হয়। তবে আমার ছোট মেয়েটি বেশ চমৎকার বাংলা শিখছে।"

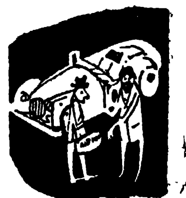
"শিখবেই তো"—আমি বলি—"ছোটরা খুব তাড়াতাড়ি নতুন ভাষা শেখে।"

ডক্টর মোডে তখন কোটের পকেট হাতড়ান। বলেন, দাঁড়ান আপনাকে মেয়ের ছবি দেখাচ্ছি।"

পকেট থেকে বেরোল এক ফটো। তিন চার বছরের ফুটফুটে মেয়ে শাড়ি পড়ে খিল খিল হাসছে। ডক্টর মোডের চোখে মুখেও তখন বাৎসল্যের রসে স্নিগ্ধ স্মিত হাসি। ফটোটা হাতে নিয়ে বল্লেন, "আমার মেয়ে আজকাল ফ্রক পরতেই চায় না।"

বন্ধুবৎসল, সদালাপী এই জর্মন পণ্ডিতের সঙ্গে আবার দেখা সেদিন 'নেতাজী ভবনে' এক অনুষ্ঠানে। দোহারা চেহারা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে চুরুট, মাঝবয়সী ডক্টর মোডে এগিয়ে এলেন সৌহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে।

নেতাজীর জর্মন প্রবাসের বহু স্মৃতিচিহ্ন ডক্টর মোডের কাছে ছিল, সব তিনি দান করেছেন নেতাজী ভবনে। আমার বোম্বাই প্রবাসী বন্ধু শ্রীসলিল ঘোষ বার্লিনে এই ডক্টর মোডের বাড়িতেই দেখতে পান, জর্মনি প্রবাসকালে নেতাজী সম্পাদিত এবং ইংরেজী ও জর্মন ভাষায় প্রকাশিত কয়েকখণ্ড দ্বি-ভাষী পত্রিকা 'আজাদ-হিন্দ'। ঐ পত্রিকা ভারত ও জর্মনীতে আর কারও কাছে নেই। তিনি ডক্টর মোডের কাছ থেকে এনে ঐগুলিই দান করেছেন নেতাজী ভবনে।



রাজ-অতিথি

বোধকরি মিশরের ভূতপূর্ব রাজা ফারুকই বলেছিলেন, 'শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে পাঁচ রাজা—তাসের চারজন আর ইংলণ্ডের একজন।'

নিজ অদৃষ্টের কথা ভেবেই ফারুক এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন

কিনা জানিনে ; কিন্তু চারিদিকের হালচাল দেখে সত্যিই মনে হয়, হায়রে কবে কেটে গেছে 'রাজরাজড়ার' কাল। পৃথিবীর রাজাদের সংখ্যা এখন আঙ্গুলে গোনা যায়। অবশিষ্ট কয়েকেরেই একজন কয়েকদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি জিগমি দোরজি ওয়াংচুক—ভোটানের মহারাজা।

হিমালয়ের কোলে ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য ভোটান। এইতো সেদিন প্রধানমন্ত্রী ঘুরে এলেন ভোটানে। চীন আর ভারতের মাঝখানে এই মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজ্যের দিকে ইদানীং নজর পড়েছে সকল দেশের। নানা জল্পনাকল্পনা চলছে ভোটানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মহারাজ কিন্তু নিজ রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্নের আশঙ্কায় তেমন ভীত নন।

এমন জনপ্রিয় মহারাজা আর কোনদিন ভোটানের সিংহাসনে বসেননি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই মহারাজা ভোটানে নিয়ে এসেছেন আধুনিকতার আলো। সংস্কারের কাজে হাত দিয়ে তিনি তুলে দিয়েছেন দাসত্বপ্রথা, মৃত্যুদণ্ড। সমান অধিকার দিয়েছেন নারীকে। ভোটানবাসীকে শিক্ষিত করার কাজে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভোটান রাজ্য সম্পর্কে মহারাজার আশ্চর্য জ্ঞান দেখে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'আপনি এত জানেন কী করে ?' মৃদু হেসে ৩১ বছরের রাজা জবাব দিয়েছেন—'তার একমাত্র কারণ আমি ভোটানেরই লোক।'

মহারাজা ভারতে এসেছেন কয়েকবার। ইউরোপেও গিয়েছেন। মহারাণীকেও ইউরোপ ঘুরিয়ে এনেছেন। তিনি হিন্দী, ইংরেজি নেপালী গড়গড় করে বলতে পারেন। মহারাজার সখ ? অনেক। ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, ফটো তোলা আর সব্জী বাগানে মেতে থাকা।

মহারাজা কলকাতায় এসেছিলেন তাঁর অসুস্থা পিসীমাকে

দেখতে। পিসিমা সেদিন এক নার্সিং হোমে মারা গিয়েছেন। ভোটানের আইন অনুযায়ী পিসিমার সম্পত্তি ভাইপো পায়। সেই সুবাদে মহারাজা তাঁর পিসিমার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন।

মহারাজার পিসীমাকে আশীর্বাদ করতে কলকাতায় এসেছিলেন আর একজন তিব্বতী ধর্মগুরু। তিনি কর্‌মা-পা—তিব্বতের 'লাল টুপী' বৌদ্ধসম্প্রদায়ের নেতা। ভোটানের আর সিকিমের রাজ পরিবার তাঁর শিষ্য।

কর্‌মা-পার বয়স বছর সাঁইত্রিশ। মজবুত বলিষ্ঠ চেহারা। চোখেমুখে কেবল হাসি। কথা বলছেন আর হাসছেন। কিন্তু 'বাইরের হাসির ছটার' আড়ালে 'ভিতরে' অশ্রুজলের আভাস পাওয়া গেল তিব্বতের প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে।

এই ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধগুরু দলাই লামার স্বদেশ ত্যাগের কিছুদিন আগে ভারতে চলে আসেন অনুগামী তিনশত শিষ্য নিয়ে। তিনি এখন আছেন সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক থেকে আট মাইল দূরে রুমটেকের মঠে। সঙ্গে যে ধনরত্ন নিয়ে এসেছেন, তাই দিয়েই চলছে তাঁর আর তাঁর তিনশত শিষ্যের ভরণপোষণ। রুমটেকের মঠে ধর্মচর্চায় তাঁর প্রবাসী-দিন কাটে।

তিব্বতী দো-ভাষীর মারফৎ কর্‌মা-পা বললেন, "ধর্ম ছাড়া আমি কিছুই বুঝিনে। ধম যেখানে নিরাপদ,আমি সেখানেই আছি। তিব্বত? হ্যাঁ তিব্বতে সেদিনই ফিরে যাব, যখন ধর্মচর্চা সেখানে নিরাপদ হবে। আমি শুধু চাই তিব্বত থেকে ধর্ম যেন বিদায় না নেয়।"

কর্‌মা-পার মনের ব্যথা কোথায় বোঝা যায়। এখানে হয়ত তিনি সুখেই আছেন, কিন্তু অনুমান করতে পারি তাঁর মন পড়ে রয়েছে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতের মাটিতে—যেখানে কান পাতলে এখনও শোনা যায় 'ওঁ মণি পদ্মে হুম' মন্ত্রের গভীর ধ্বনি।

করমা-পা বললেন, লামাবাদ আর সাম্যবাদ একসঙ্গে টিঁকে থাকতে পারে তিব্বতের মাটিতে। একে অন্যে তো ভয়ানক বিরোধ নেই?'

করমা-পা দলাই লামার সঙ্গে সারনাথে দেখা করে এসেছেন। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তিব্বতী লামাবাদের সংস্কার করার কথা দলাই লামা বিবেচনা করছেন।

করমা-পা পূর্ব-তিব্বতের ধর্মগুরু। বিদ্রোহী খামপার অধিকাংশই তাঁর শিষ্য। ১৯৫১ সালে তিনি যখন দলাই লামা আর পাঞ্চেন লামার সঙ্গে পিকিং যান, কম্যুনিস্ট নেতারা নাকি খামপাদের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করার অনুরোধ তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন।

ধর্মচর্চার পরই করমা-পার সখ পাখী সংগ্রহে। তিব্বতে তাঁর মঠে অনেক রকমের পাখীর সংগ্রহ আছে। ঐ পাখীদের কথা ভেবেই তাঁর মন এখনও উদাস হয়ে যায়, করমা-পার হাতে ছিল একটা এলবাম। সেই এলবাম ছেড়ে-আসা মঠের পাখীদের ছবিতে ভরা। দেখা গেল, তিনি পরম স্নেহে এলবামের ছবির গায়ে হাত বুলাচ্ছেন আর একটি একটি করে চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে।



পকেট মার

রিসিভার তুলতেই খনখনে গলার আওয়াজ।

"হ্যালো, কাকে চান? ইয়েস, বলুন।"

"দেখুন, আমি নানা কোয়াবেনা কেনা"—

"কী যা-তা বলছেন, নানা-বেনা-কেনা—ছেলেভুলানী ছড়া শোনাচ্ছেন নাকি? মনে রাখবেন, এটা অফিস, 'পিওর' খবরের

কাগজের অফিস"—হিন্দুস্থান রর্ভোওয়্যাস্ট সদাফিটফাট কেতাদুরস্ত বয়স্ক রিপোর্টার এই প্রান্তে প্রায় খেঁকিয়ে ওঠেন।

—"মানে আমি হলুম গিয়ে কেনা অব ঘানা"—অপর প্রান্তে আবার কল কল নিনাদ।

"কেনা অব ঘানা?—সেটা আবার কী?"

"কী নয়, কে বলুন। আমার নামই নানা কোয়াবেনা কেনা, হাই কমিশনার অব ঘানা।"

"ঘানা মানে ছ্যাট এন্‌ক্রুমা"—

"ইয়েস।"

"ছ্যান ইয়েস স্যার",—রিপোর্টার ভদ্রলোকের তখন অন্য চেহারা, অন্য গলা। মোলায়েম কণ্ঠে বলেন—"আপনার জন্যে কী করতে পারি?"

ভারতে ঘানার হাই কমিশনার বলেন, "দেখুন দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছি দিন দুই। আজ দুপুরে বেড়াতে গেছি নিউ মার্কেট। সেখানে কিক-পকেট। সোনার টোপর-পরা আমার পার্কার পেন বেমালুম হাওয়া। আচ্ছা ধন্যবাদ। মনে রাখবেন, বড় প্রিয় এ কলম আমার।"

রির্পোটিং বিভাগ তোলপাড়। ভাল খবর। লালবাজার, তালতলা থানায় টেলিফোনের পর টেলিফোন। হ্যালো ডি-সি-ডি-ডি, হ্যালো ও-সি তালতলা, হ্যালো-হ্যালো, সি-পি আছেন? পুলিশ কমিশনার? সকলের দুশ্চিন্তা। কলকাতার যেন দুর্নাম না রটে! বিদেশী কূটনীতিবিদ প্রথম কলকাতায় এসেই যেন বাংলাদেশ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে না যান।

লালবাজার বলে, আমরা কিছু জানি না। তালতলা বলে আমাদেরও জানা নেই। কোন রিপোর্ট নেই, ডায়েরী নেই। তবু দেখছি।

কী ব্যাপার? তবে কি কেউ রসিকতা করল টেলিফোনে? তা তো মনে হয় না। আবার টেলিফোন গ্র্যাণ্ড হোটেলে। সেখানেই উঠেছেন মিস্টার কেনা। সস্ত্রীক। এখন বেরিয়ে গেছেন।

রাত ন'টায় পুলিশ কমিশনার উপানন্দ মুখার্জিকে টেলিফোন করা হ'ল। তিনি বললেন, হ্যাঁ খবরটা ঠিকই। তবে ঘানার হাই কমিশনার কোন তদন্ত চান না বলে জানিয়েছেন।

তদন্ত চান না? কেন? তাহলে খবরের কাগজে টেলিফোনই-বা কেন করলেন?

কলমটা কি আসলে পিক-পকেট হয় নি, নিজেই কোথাও হারিয়ে ফেলেছেন? সেদিন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে সে রহস্যের কিনারা হয় নি।

খবরটা শুনে আমার কিন্তু মনে হয়েছে, সত্যি সত্যি পিক-পকেট হয়ে থাকলে তালতলার পুলিশ নির্ঘাৎ বের করে দিতে পারত। ঐ এলাকায় যে ক'জন ভি-আই-পি কলম হারিয়েছেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই পুলিস মারফৎ ফেরৎ পেয়েছেন। চেনা পিক-পকেটি-দের থানায় ডেকে এনে ধমক দিলেই ওরা নাকি মাল দিয়ে দেয়। ফার্পোর সামনে তখনকার শ্রমমন্ত্রী আবদুল সত্তারের কলম পিক-পকেট হয়েছিল। গোল্ড-ক্যাপ পার্কার। থানায় খবর দিতেই পরদিন সকালবেলা সত্তার সাহেবের বাড়িতে সেই কলম ফেরৎ দিয়ে গেছে পুলিস। আরও কয়েকজন মন্ত্রীর একই সৌভাগ্য হয়েছে। ঘানার হাই কমিশনার আর এক কাঠি বাড়া। ভি-আই-পি। তদন্ত চাইলে কলম মিলতই।

তবে হ্যাঁ, এই লেখা পড়ে আপনি আবার চৌরঙ্গী পাড়ায় কলম পিক-পকেট করিয়ে পুলিসকে টেস্ট করতে যাবেন না। ভি-আই-পি হোন তো আগে তারপর টেস্ট করে দেখবেন আমার কথা সত্যি কি না।



ঘাট পাণ্ডা

ওদের বলে ঘাট পাণ্ডা। গঙ্গার ঘাটে সার সার বসে থাকে। ভুড়ি বাগিয়ে, টিকি ঝুলিয়ে এবং ঠোঁটের ডগায় হাসি ঝুলিয়ে। গঙ্গায় নেমে ডুব মারলেই তো পুণ্যি হয় না। পুণ্যি কামাতে অনেক কাঠখর পোড়ানোর দরকার। তার জন্যেই ডাক পড়ে ঘাট পাণ্ডার।

ঘাট পাণ্ডারা বসে থাকে ফুল, সর্ষের তেল, সিঁদুর, নিমের দাঁতন এবং দেব-দেবীর ফটো নিয়ে। আপনার যা দরকার সব দেবে। স্নানে নামবেন, আপনার জামাকাপড় কে দেখবে? কেন ঐ ঘাট পাণ্ডা। পুরুত ডাকা দরকার। কে ডাকবে? কেন ঐ ঘাট পাণ্ডা। ঘাট পাণ্ডাকে বললেই সব কাজ হাঁসিল, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

কলকাতায় ঘাট পাণ্ডাদের সংখ্যাও বড় কম নয়। প্রায় ছ' সাত শ'। এক মল্লিক ঘাটেই দু'শ। পোর্ট কমিশনার্সের কাছে নাম রেজেস্টারী করাতে হয় তাঁদের। সাধারণতঃ মেয়াদ থাকে ছ' মাসের। তারপর নতুন চুক্তি।

ঘাট পাণ্ডাদের বেশির ভাগই উড়িষ্যাবাসী। পূর্বপুরুষানুক্রমে ঐ কাজ তারা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের চার্জও তেমন বেশি নয়। আনা থেকে চার আনার মধ্যে। এক ঘাট পাণ্ডা বলে—"তা বাবু মাসোরে আশী নব্বই টংকা মিলিছন্তি।" খবর নিয়ে দেখেছি, কতকটা ঠিক তাই। ওদের রোজগার মাসে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা। গ্রীষ্মকালে বাড়ে। আর ধর্মানুষ্ঠানের দিনে। চূড়ামণিযোগে, মহালয়ায় ওরা বেশ দু পয়সা কামায়।

কিন্তু সে তো একদিন বা দিনের। ওদের রোজগার দিন দিন কমছে। মল্লিক ঘাটের একজন বুড়ো পাণ্ডা বললো, সে নিজেই মাসে দেড়শ দু'শ টাকা কামিয়েছে। এখন আদ্ধেকও হয় না, অথচ জিনিসপত্রের দাম চড়চড় চারগুণ আটগুণ বেড়েছে। চলে কী করে। সে ভাবছে এ কাজ ছেড়ে দেবে।

শুধু এই ঘাট-পাণ্ডাটি নয়, আরও অনেকের মনেই এক হতাশা। লোকের ধর্মে-কর্মে মতি নেই, এদের রোজগারপাতিও নেই। মাথা নেই তো মাথাব্যথা।

আর একজন টিকিধারী ঘাট পাণ্ডা হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে —ছাড়বে বললেই কি ছাড়া যায় বাবু আট পুরুষের কাজ, অত সহজ নয়, গঙ্গা মাইজীর টান জবর টান। কতবার ভেবেছি ছেড়ে দেব, আবার ঘুরে ফিরে এই মল্লিক ঘাটে—



সেই ভদ্রলোকটি

ভদ্রলোককে আপনিও দেখেছেন,—জন্মোৎসবে, শোকযাত্রায়, জনসভায়। চেহারাটাই শুধু চিনে রাখেননি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হওয়া দরকার।

অনেক রকম বাতিক আছে লোকের। আপনার আমার সকলের। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের শ্রীগোপাল লাহার বাতিক নূতন ধরনের। ভদ্রলোকের বাতিক সভাসমিতিতে উপস্থিত থাকা।

মনুমেণ্টের তলায় ট্রাম মজদুরদের সভা হচ্ছে, গোপাল লাহা সেখানে আছেন, হাজরা পার্কে ধর্ম্মসম্মেলন হচ্ছে, গোপাল লাহা

সেখানে আছেন, মহাবোধি সোসাইটি হলে কোন মনীষীর স্মৃতিসভা হচ্ছে, গোপাল লাহা সেখানেও আছেন, রামমোহন লাইব্রেরী হলে 'অথর্ববেদের' আলোচনা সভায় যে সাতজন শ্রোতা বসে আছেন, তার একজনও সেই গোপাল লাহা, লোয়ার সার্কুলার রোডে দীনবন্ধু এণ্ডরুজের সমাধিবেদীতে মাল্যার্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একজনও সেই গোপাল লাহা। অর্থাৎ টালা থেকে টালিগঞ্জ পারতপক্ষে কোন সভাই তিনি বাদ দেন না।

সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের ছেলে গোপাল লাহা। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। গায়ে ফুলশার্ট, ধুতি, চোখে চশমা। নিরীহ নির্বিবাদী চেহারার মানুষ। গত কয়েক বছর আমি দর্শনীবিহীন যে কয়টি সভাসমিতিতে যোগ দিয়েছি, তার প্রায় সব কটিতেই তাঁকে দেখেছি, কৌতূহলী হয়ে শেষমেষ আলাপ করে ফেলেছি।

লাহা বললেন—কখনও কখনও 'সীজন' 'ডাল' যায়, কখনও কখনও মিটিংয়ের মরশুম। তখন সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে অনেক সভাই বাদ পড়ে যায়।

ঘুম থেকে উঠেই তিনি খবরের কাগজ খুলে দেখেন সভা-সমিতির বিজ্ঞপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে দিনের প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে যায়। সাড়ে তিনটেয় অমুক জায়গা, পাঁচটায় অমুক জায়গা। কোন কোন দিন চার পাঁচটা মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে হয়। কোন কোন সময় দুটো সভা এক সঙ্গে পড়ে যায়, বড় অসুবিধে হয়। প্রশ্ন করেছিলাম, কেন তিনি সভা-সমিতি নিয়ে এত মেতে আছেন। উত্তরে বলেছেন,—"ঠিক জানিনা কেন যাই, তবে যেতে ভাল লাগে, সখ বলতে পারেন।"

সেদিন এক অনুষ্ঠানে গোপাল লাহার সঙ্গে দেখা। বললাম—"কী ব্যাপার অনেকদিন দেখিনি যে!"

জবাব এল—"অসুখ করেছিল, মাঝখানে অনেকগুলো সভা বাদ পড়ে গেছে।" তার কণ্ঠে কিছুটা আপশোসের সুর।



কৃপাশংকর

দুপুরে কর্তারা যখন অফিস-বন্দী, যখন কলতলায় এঁটো বাসন ঝির অপেক্ষায় পড়ে থাকে, দরজায় খিল এঁটে গিন্নী-মা ভাত-ঘুমের মউজে মাদুর বিছান, তাঁর মুখের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে গল্পের বই, ঠিক সেই সময় যাঁরা সদর রাস্তায় হঠাৎ-হঠাৎ হাঁক দিয়ে বেড়ান, কৃপাশংকর বাজপেয়ী তাঁদের একজন। বাড়ি লখনউ, কলকাতার ঠিকানা রায় বাহাদুর রোডের বস্তি।

কৃপাশংকরজী আজ অনেক বছর আছেন কলকাতায়। হাতে গজকাঠি, পিঠে কাপড়ের বোঝা, এক মাথা রোদ নিয়ে তিনি ঘর ঘর ফিরি করে বেড়ান। স্ব-রাজ্য আর ভিন রাজ্য মিলিয়ে এই শহরে ফিরিওলার সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার। কৃপাশংকর তাদের দলের।

সেদিন কৃপাশংকর বাজপেয়ীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। 'চাই ছিট কাপড়' হাঁক দিয়ে দিয়ে তিনি হয়রান, বাড়ির দোর-গোড়ার বসে এক গেলাস জল চেয়েছিলেন। তখনই একথা সেকথা নানা কথা।

তাঁর বয়স পঞ্চান্ন মুখ রোদে পোড়া। আসল গৌরবর্ণের পুনরুদ্ধার প্রত্নতাত্ত্বিকের অধ্যবসায় ছাড়া অসম্ভব। তাঁর বড় ছেলে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। কাজ করে উত্তর প্রদেশের শিক্ষা-দপ্তরে। তিন শ' টাকা মাইনে। মেজ ছেলে এখনও ছাত্র, কলেজের। স্ত্রী বিগত, মেয়ে বিয়ের অপেক্ষায়।

বললেন, "বাবুজি, ছেলেরা চায় না আমি ফিরি করি। লেকিন না করলে চলবে কেমন করে। দশ হাজার রুপিয়া দেনা, দেশে কারবার করে গচ্চা দিয়েছি, তা'তো শোধ করতে হবে। এবং সেই

জন্যেই কলকাতায় চলে এলাম। অল্প টাকায় শুরু করেছি, এখন মন্দ চলে না। মাস ১৫০৲ থেকে ১৬০৲। পঞ্চাশ রুপিয়া নিজের খরচ, বাকি মুলুক ভেজে দিই। ঋণের টাকা অনেক কমিয়ে ফেলেছি।"

জলের গেলাস খালি করে কৃপাশংকর আবার পিঠে বোঝা চাপালেন। একগাল হেসে বললেন, "এমনি চলেছে অনেক বছর, একদিনও কামাই নেই। সকাল ছটায় বেরোই, ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে! গড়ে ক' মাইল হাঁটি? বাবুজি বিশ পচ্চিশ মাইল হবে।"

কৃপাশংকরজী সামনে এগোলেন। পেছন থেকে দেখা গেল বোঝার ভারে আনত একটি বলিষ্ঠ দেহ চলছে, চলছে, চলছে।



পাগল হইয়ে

স্থান-স্টুটারকিন স্ট্রীট, আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনের সম্মুখ। কাল—অপরাহ্ণ। সাধারণ পথচারীর মতই ভদ্রলোক এগিয়ে যাচ্ছিলেন। খোঁচাখোঁচা চুল, চোখে চশমা, আধময়লা ধুতি পাঞ্জাবী. পায়ে পম্পশু। এক হাতে লাঠি, আর হাতে রেশন ব্যাগ। বেশ যাচ্ছিলেন। আনন্দবাজার অফিসের সামনে আসতেই হঠাৎ আক্রান্ত যোদ্ধার মত যাত্রাগানের ভঙ্গীতে তিন পা পিছিয়ে হাতের ছড়ি ঘুরিয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা সুরু করলেন—

—"নাম শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। বয়স বাহান্ন বৎসর। নিবাস বারুইপুর। জেলা চব্বিশ পরগণা। আমি শ্রীহরেন্দ্র চক্রবর্তী ভারতের

একমাত্র রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বীকার করি না প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে। আর সংবিধান? সেও আমার কাছে অস্বীকৃত। গত ১৯৫৩ সালের ৭ই মার্চ আমারই আপত্তিতে ভারতের সংবিধান অবৈধ। আমার আপত্তি স্বীকার করে নিয়েছে হল্যাণ্ডের রাজধানী দে হেগের আন্তর্জাতিক বিচারালয়। সুতরাং হোয়াটস হোয়াই"—

চেঁচামেচিতে লোকজন জমে গেল। কে এই ভারতের নূতন রাষ্ট্রপতি? খবরের কাগজের অফিসের দারোয়ান, পিয়ন ভিড় জমালো। ভিড় জমালো রিক্সাওলা ঠেলাওলা। পানের দোকান চায়ের দোকান ফেলে এল দোকানদার। অতিব্যস্ত পথচারীরাও থামলেন। অর্থাৎ চারপাশে এক ক্ষুদ্র জনতা।

বারুইপুরীয়া রাষ্ট্রপতির উৎসাহ বেড়ে গেল। মনে হল পার্লামেণ্ট ভবনের ডগায় এক উঁচু প্ল্যাটফর্মে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন কিংবা ফুলের মালা গলায় লালকেল্লার অলিন্দে। সামনে বিশাল জনতার সমুদ্র। ফুটপাতে লাঠিটা দুবার ঠুকে সমস্ত শরীর ও গলা কাঁপিয়ে ইংরেজি-বাংলায় আবার চলল—

"—আমি রাষ্ট্রপতি শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী ঘোষণা করছি, আজ থেকে আমি সমস্ত ডিক্টেটোরিয়েল পাওয়ার্স নিজের হাতে গ্রহণ করলাম। দেশের যে দুর্দশা, দেশের যে অবর্ণনীয় দুর্দশা, দেশের যে অতি অবর্ণনীয় দুর্দশা, তার থেকে জাতিকে বাঁচাতে নিজেকে ডিক্টেটর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কেন নেই, তা সত্বর জানবেন।"

ভিড় বেড়ে গেছে। দু একটা হাততালিও পড়ল। বক্তৃতায় উৎসাহও বাড়ল।

"জানি, আমি জানি, নিশ্চিতরূপে জানি, দেশের পরিত্রাতা আমি। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। সংস্কৃতে বলে, 'নান্য পন্থাঃ' বাংলায় বলে, অন্য রাস্তা নেই, ইংরেজীতে বলে 'দেয়ার ইজ নো

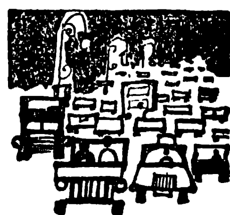
আদার ওয়ে।' সুতরাং অতএব কাজে-কাজেই আই মাস্ট গেট অল পাওয়ার্স। তা' আমি পেয়েছি। সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছি নিজ স্কন্ধে।"

হঠাৎ খাদে গলা নামিয়ে বললেন—"কিন্তু আসল কথা কি জানেন, দেশের উন্নতির একমাত্র অন্তরায় ঐ ওয়েস্ট বেঙ্গল নামটা। সো আই ডিক্লেয়ার"—গলা আবার চড়ল—"নিউ সোভারিন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঙ্গল, আই ডিক্লেয়ার—"

জনতা আর একটি ঘোষণা শোনার জন্যে উৎসুক। কিন্তু ভদ্রলোক হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন—না, ডিক্লেয়ারেশনটা আজ মুলতুবি থাক। ট্রেনের সময় হয়ে এল। কিন্তু ভুলে যাবেন না, নাম শ্রীহরেন্দ্র চক্রবর্তী, বয়স বাহান্ন বৎসর, নিবাস বারুইপুর, জেলা ২৪ পরগনা—ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রপতি—

রাষ্ট্রপতি আসর খালি করে চলে গেলেন। সেপাই সান্ত্রীঘেরা জুড়ি গাড়ি চড়তে নয়, ট্রেন ধরতে। লোক্যাল ট্রেন।

পেছনে পেছনে এগোলাম। ও হরি কোথায় ট্রেন ধরা। "মহামান্য রাষ্ট্রপতি" মহোদয় আবার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের রাষ্ট্রপতিত্ব লাভের সংবাদ সাড়ম্বরে ঘোষণা করছেন।



ট্রামে ট্রামে সেই বার্তা

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যে ট্রামের ঘর, তারি মধ্যে বসে আছেন শিব সদাগর।'

শিব সদাগরের সংখ্যা এক নয়, অনেক। খুপরিতে খুপরিতে হাঁসফাঁস করছেন, উঠছেন, বসছেন, গালমন্দ করেছেন। কিন্তু নট

চড়ন নট কিচ্ছু, বৃষ্টির জালে একেবারে বন্দী।

এসপ্ল্যানেড গুমটির কাছাকাছি সেদিন দুপুরে অঘটন। লম্বা ট্রেনের মত একত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ—এই তিন রুটের সার সার ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাইরে অঝোর ধারা, নামতে গেলেও দোর গোড়ায় এক হাঁটু জল। শিব সদাগরদের মেজাজ তৎক্ষণাৎ তিরিক্ষি হয়ে গেল।

—"ও কণ্ডাক্টার দাদা, এ কোথায় এনে ফেললেন, নিজে নড়বেন না, আমাদেরও নামতে দেবেন না ?"

—'দিন মশাই পয়সা ফেরৎ, প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে ইয়ার্কি ?'

কণ্ডাক্টার না শোনার ভাণ করেন। যাত্রীদের সঙ্গে বাক্যালাপের চেয়ে বাইরের নিসর্গ শোভাই তাঁর বেশি পছন্দ।

প্রায় বারো মিনিট পেরিয়ে যায়। হঠাৎ পেছন থেকে এক তরুণীকণ্ঠের আর্তনাদ—"ঈ-স্ আমার বারোটার ক্লাস মাটি হয়ে গেল।"

"একটার ক্লাস পান্ কিনা দেখুন– "

ওপাশ থেকে এক ভদ্রলোক টিপ্পনি কাটলেন চাপা গলায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীটি কটমট করে তাকিয়ে ভদ্রলোককে ভস্মসাৎ করে ফেলেন আর কি !

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অশ্রান্ত বর্ষণ বোধ হয় নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ আর একজনের গলা খাঁকারি,—ইম্‌পসিব্‌ল, আইন-ফাইন জানিনে মশাই, সিগারেট না ধরিয়ে পারছি নে, এদিকে তাকিয়ো না বাবা কণ্ডাক্টর।"

একজন ধরাতেই পটাপট দশ বারোটা সিগারেটে আগুন ধরল। কণ্ডাক্টারও সাহস পেয়েছেন এতক্ষণে। একটি বিড়ি ধরিয়ে তিনি বললেন—"ভাগ্যিস অফিস টাইমে হয়নি. নইলে আমাকে আপনারা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতেন।

"এখনও যে আস্ত থাকবেন এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।

সাড়ে বারোটায় আমার এক জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, সময়মত পৌঁছাতে না পারলে লাখ টাকার লোকসান। এখন বারোটা দশ। আর কুড়ি মিনিট বাকি। মনে থাকে যেন—" ষণ্ডামার্কা চেহারার প্যাসেঞ্জারটি আঙ্গুল তুলে কণ্ডাক্টারকে শাসালেন।

কণ্ডাক্টার মাইডিয়ার ভাব আনার চেষ্টা করেন। বলেন--"এই নতুন গাড়িগুলোই বজ্জাত। পুরানো গাড়ির ইঞ্জিন ছিল সাত ইঞ্চি উঁচু, এখনকার ইঞ্জিনগুলো উঁচু মাত্র পাঁচ-ইঞ্চি। একটু জল লাগলেই ইঞ্জিনে আগুন। ব্যস, হয়ে গেল।"

পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রলোকটি খেঁকিয়ে উঠলেন—"হ, হ, জানা আছে হকল হালাগো। যেমন আমাগো গবর্নেমেন্ট, তেমনি আপনাগো ট্রাম কোম্পানী।"

কণ্ডাক্টার আর ঘাঁটাঘাটি করলেন না। তার চেয়ে ওই নিসর্গ শোভায় মন দেওয়াই ভাল।

ইতিমধ্যে এক কোণে খোসগল্প সুরু হয়ে গেছে। কে একজন মিনমিনে গলায় হিন্দী গানের সুরও ভাঁজছেন, একক মহিলা যাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ছাত্রীটি ক্লাশনোটে মনোনিবেশ করছেন, একজনের হাতের খবরের কাগজ পাঁচজনে ভাগাভাগি করে গিলে খাচ্ছেন! এবং বাইরে যথারীতি বৃষ্টির তাণ্ডব।

বারোটা কুড়ি। প্রায় আধ ঘণ্টা কাবার। খাঁচা ছেড়ে ট্রামের ড্রাইভারও কণ্ডাক্টারের পাশে এসে বসেছেন। পকেট থেকে কৌটা বের করে তিনি খৈনি বানাচ্ছেন। এই অচলাবস্থায় এঁরা দুজনেই সম্পূর্ণ নির্বিকার। কণ্ডাক্টার শুধু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ষণ্ডামার্কা চেহারার ভদ্রলোকের দিকে তাকাচ্ছেন আড়চোখে।

বৃষ্টি চলছেই। ফুচকাওয়ালা সস্তা ওয়াটারপ্রুফে নিজের গা আর ফুচকার ঝুড়ি ঢাকা দিয়ে ট্রাম লাইনের পাশটাতে ভিজছে, মিটার নামিয়ে হনহন ছুটে গেল পর পর তিনখানা ট্যাক্সি, পর্দানশীন

রিক্সাগাড়ি ডবল কদমে পার হচ্ছে রাস্তা, মনুমেণ্টের তলায় এক গাদা লোক, গড়ের মাঠের গাছের সারি জলের তোড়ে নৃত্যশীলা, আকাশে হঠাৎ কড় কড় কড়াৎ।

এবারে সকলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। মরীয়া হয়ে একজন প্যাসেঞ্জার ট্রাম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছেন, আরও দুজন মালকোঁচা মেরে জুতো বগলদাবা করে 'ব্রজেন দাস' হবার তোড়জোড় করছেন ঠোঁটের-ডগায় ছুঁচোলো গোঁফ আঁটা চিমসে ভদ্রলোক হতাশ সুরে বলেন—'একেই বলে উঠান-সমুদ্র, দশ গজ দূরে চৌরঙ্গীর উপরেই আমার অফিস, অথচ যেতে পারছি না।'

"ঝাড়ু মারি মশাই ট্রামের কপালে। বাস হলে জল ঠেলে বেরিয়ে যেত,—গোলগাল চেহারার টেকো মাথা প্যাসেঞ্জারটি এতক্ষণে মুখ খুললেন। এবং আরও কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই চারদিকে শোনা গেল 'ঈস, ধুৎতেরি, হরিবল, সর্বনাশ, কেলেংকারিয়াস' ইত্যাদি শব্দের বিচিত্র কলরব।

সামনের দু'খানা ট্রাম হঠাৎ যেন নড়েচড়ে উঠল। প্যাসেঞ্জার-দের কণ্ঠে ঢেউ খেলে গেল উল্লাসধ্বনি।—"ঘন্টি মারুন। আমাদেরটা ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন।"

কিন্তু ও হরি, ঐ নড়াচড়াই সার। আবার যে-কে সেই। ন-যযৌ ন তস্থৌ। কণ্ডাক্টার করুণ গলায় আগেভাগেই নিবেদন করে ফেললেন—"বৃষ্টি না থামলে আমি কী করব বলুন, ট্রাম চললেও তো আপনারা নামতে পারবেন না।"

"কিচ্ছু হবে না, রাম ধোলাই দিলেই আপনারা সায়েস্তা হবেন,—" একসঙ্গে দশটি গলা হৈ হৈ করে উঠল।

ছোকরা বয়সী এক ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীটির দিকে তির্যক, দৃষ্টি ফেলা আপাতত মুলতুবি রেখে বলল—"ঝগড়াঝাটি করে লাভ কি দাদু, তার চেয়ে বরং তাস থাকলে বের করুন, দু হাত খেলে

সময় কাটানো যাবে।”

“মরছি প্রাণের জ্বালায়, উনি বলছেন তাস খেলতে। তার চেয়ে বলো না, খিচুড়ি চড়িয়ে দেওয়া যাক!” জনৈক বৃদ্ধের জনান্তিক উক্তি।

এদিকে এক ফেরিওয়ালা কোথা থেকে ভিজতে ভিজতে এসে ট্রামে উঠে পড়েছে। “লজেন্স, মিষ্টি লজেন্স, অম্বলের ব্যথা সারে, মুখ ঝরঝড়ে হয়, দাঁতের গোড়ালি শক্ত হয়, নেবেন নাকি দাদুরা। এই যে লজেন্স, আনায় দশটি করে’ লজেন্স, লজেন্স—”

দু চারজন কিনলেন। ফিরিওয়ালা কাছে আসতেই একজন বললে—“সবই তো হয় বুঝলাম, কিন্তু ভায়া, এই লজেন্স খেলে বৃষ্টি থামে কি না বলতে পারো?’

“কী দরকার দাদু বৃষ্টি থামার বেশতো রেস্ট নিয়ে নিচ্ছেন বিনি পয়সায়। ট্রাম থেকে নামলেই তো সেই দৌড়ঝাঁপ সুরু হয়ে যাবে” —ফাজিল ফিরিওয়ালা টিপ্পনি কেটে অন্য ট্রামে ছুটে যায়।

বৃষ্টি ও ট্রাম কোম্পানীর বাপান্ত করে করে সবাই যখন হয়রান সেই সময়ই কী আশ্চর্য, আকাশ হঠাৎ পরিষ্কার। বৃষ্টি থেমে গেছে।

“নামুন, নামুন, জলদি নামুন।’

ট্রামের ভেতর ঠেলাঠেলি সুরু হয়ে গেল। কেউ কাঁচা হাতে, কেউ জুতো বগলে, কেউ ফুলপ্যান্ট গুটিয়ে; কেউ শাড়ি ভিজিয়ে এক সেকেণ্ডে ট্রাম খালি করে দিলেন। কণ্ডাক্টার তাকিয়ে দেখেন, কোণে শুধু বসে আছেন এক ভদ্রলোক। তাঁর কানের কাছে গিয়ে চীৎকার পাড়েন—‘ও মশাই, বৃষ্টি থেমে গেছে।’

গভীর ঘুম থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে তিনি বললেন—‘অ্যা, এতক্ষণ বৃষ্টি পড়ছিল নাকি?